ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607002

নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা*: প্রান্তজনের জীবনধারায় ঔপনিবেশিক অভিঘাতের স্বরূপ

তাশরিক-ই-হাবিব*

Abstract: Kazi Nazrul Islam deserves prominence as a fiction writer. *Mrityukhudha* is his representative literary work. The novel is set against the background of Krishnanagar, a traditional town in West Bengal, part of integral India, which had been converted into a British colony. The driving force behind this essay is to explore the relevance of reading the novel in depth, considering the socio-economic and political-cultural context of British colonial rule in undivided India. An important aspect of the novel is the objective portrayal of the conversion of subaltern Bengali Muslims and Hindus in the fritge of the country, in line with the administration of the state by the ruling class, through the missionary campaign to spread Christianity. In the present article, just as the novelist's sense of homeland and his connection to the lives of marginalized people are explored in the light of the colonial reading of the novel.

মুখ্যশব্দ: উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অপরতাবোধ, ধর্মান্তর, প্রান্তজন

১. প্রাককথন

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭৬) গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসেবেই শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসের ধারায়ও *মৃত্যুক্ষুধা*[১] (১৯৩০) বিশিষ্টতার দাবিদার। এটি রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও[২] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরিসরে ব্রিটিশ শাসনাধিকৃত ঔপনিবেশিক ভারতের[৩] অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের পটভূমিতে লিখিত সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক আবহভিত্তিক জনজীবনপ্রবাহের শিল্পরূপ।[৪] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের বাঙালি সমাজ, বিশেষত কায়িক শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মুসলমান ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ গ্রন্থনায় নজরুল এ উপন্যাসে সতর্ক অভিনিবেশ বজায় রেখেছেন। উপন্যাসটির নিবিড় পাঠগ্রহণে তাঁর বিপ্লববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, গণমানুষের সার্বিক মুক্তির প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থনের জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের মাধ্যমে ভারতের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিসন্ধিকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের[৫] বিস্তার

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটিয়ে বাস্তবায়িত করেছে। পলাশী যুদ্ধোত্তর (১৭৫৭) প্রায় দুশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসের (১৭৫৭–১৯৪৭) পাতায় সেই রূপরেখা গ্রন্থিত রয়েছে। উপনিবেশে রূপান্তরিত ভারতের অবরুদ্ধ বাসিন্দাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গি[৬] ও স্বাধীনতা অর্জনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ শিল্পভাষ্য নজরুলের এ উপন্যাস। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাধারা ও বাঙালি জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগহেতু তাদের চেতনালোকের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনের আন্তর্গরজ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে উপন্যাসটি লিখতে।

১.১. ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক উপন্যাসটি নিবিড় পাঠের প্রাসঙ্গিকতা

কৃষ্ণনগরের গৌরবের ধারা যে কালের প্রবাহে বিলুপ্তপ্রায়, এরূপ নঞর্থক ইঙ্গিত দিয়েই উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত ঘটেছে। কৃষ্ণনগরের কুমারদের হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল বাংলার লোকশিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এ বৃত্তান্ত ক্রমশ হয়ে উঠেছে ধূলাবৃত অতীত। ইংরেজ বণিকদের ভারতে আগমন, যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার ও শিক্ষাকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষিত কেরানি সম্প্রদায় গড়ে তোলার সুপরিকল্পিত অভিপ্রায়, ভারতের বাসিন্দা বা উপনিবেশিতদের সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে শাসনব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা, ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এদেশের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ শোষণ, এমনকি ইংরেজ সভ্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে জাত-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়-শ্রেণি-গোষ্ঠীগত বিভাজনের মাধ্যমে 'ডিভাইড এন্ড রুল'১৭ নীতি কার্যকর করার নীলনকশা– উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারকেন্দ্রিক এসব প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখে উপন্যাসটি পাঠ করার সুযোগ রয়েছে। তথাকথিত পাশ্চাত্য রেনেসাঁস বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় প্রাচ্য বা ভারতবর্ষকে আলোকিত করার[৮] ঔপনিবেশিক অভীপ্সা, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অন্যকে দেখার ও দেখতে বাধ্য করার অপরতাসূচক[৯] মানসিকতা, জোরজবরদস্তিকে পাকাপোক্ত করার তাগিদে প্রান্তিকতার মানদণ্ডে নিজেদের কেন্দ্রশক্তি[১০] হিসেবে প্রতিষ্ঠার তাড়না, সার্বজনীনতার ধারণা[১১]– প্রভৃতি নীতিমালার আলোকে উপনিবেশের বাসিন্দারূপী ভারতীয় জনসমাজকে অবলোকন, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রচেষ্টা উপনিবেশক শাসকগোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে উপনিবেশিতদের বাধ্য করার মাধ্যমে তাদের স্বকীয়তা, মৌলিকতা, জাতীয়তাবোধ ও সংহতিকে বিঘ্নিত, এমনকি বিলুপ্তিকরণে সচেষ্ট ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত রূপটি নজরুলের সৃজনশীল অন্তর্বীক্ষণে বরাবর উন্মোচিত হয়েছে। এ উপন্যাসের নিবিড় পাঠে উপলব্ধি করা যায় কার্ল মার্কস (১৮১৮–১৮৮৩) বর্ণিত মন্থর-গতিহীন ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসোন্মুখ চালচিত্রের পরবর্তী রূপটিকে। পুঁজিবাদী নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সমান্তরালে সুবিধাবঞ্চিত, প্রায় অশিক্ষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা-দারিদ্র্যপীড়িত বিপন্ন জীবনযাত্রা সেই বয়ানে বাস্তবানুগরূপে বিবৃত। উপনিবেশবাসীর প্রান্তিকায়ণ পরিণতিতে কীভাবে উপনিবেশক বা শোষকগোষ্ঠীর কেন্দ্রানুগ আধিপত্য ও শক্তিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানায়, এ উপন্যাসে নজরুল পরিকল্পিতভাবে সেই আখ্যানও উপস্থাপন করেছেন।

নিম্নবর্গের প্রতিরোধ যে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশায়নের পালটা বয়ান গড়ে তুলতে সমর্থ, *মৃত্যুক্ষুধায়* সেই সাক্ষ্য রয়েছে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণার পরিণতিতে নজরুলকে যে রাজবন্দি হিসেবে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে, এ ঘটনার প্রতিফলন উপন্যাসটির নায়ক আনসারের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এমনকি প্রান্তবাসীর মনোজাগতিক উপনিবেশ থেকে শৃঙ্খলমুক্তির অভিপ্রায় যে কৃষ্ণনগরের, তথা উপনিবেশিত ভারতবাসীর ক্রমজাগ্রত সচেতনতার ধারাবাহিক পরিণতি, উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে সেই শিল্পময় উপলব্ধিও সচেতন পাঠকের বোধে অনুরণিত হয়। স্মর্তব্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্বে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও নয়া উপনিবেশবাদের আগ্রাসন একুশ শতকের বিশ্বব্যবস্থায় দাপটের সঙ্গেই অস্তিত্বশীল রয়েছে। ফলে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোগত বিলুপ্তি ঘটলেও এর উপস্থিতি ও সক্রিয়তা পূর্বের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী ভূমিকায় বিশ্বব্যাপী সক্রিয় রয়েছে। এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে বিধৃত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে কৃষ্ণনগরের বাঙালি জনজীবনে উদ্ভূত অভিঘাতসমূহের রূপরেখা অনুধাবনে আমরা সচেষ্ট থাকব।

১.২. উপন্যাসের স্থানিক পরিসরে বিদ্যমান সমাজকাঠামোর রূপরেখা

এ উপন্যাসের স্থানিক পরিসর শুধু কৃষ্ণনগরকেন্দ্রিক নয়। ভারতের পাশাপাশি তদানীন্তন ব্রিটিশ উপনিবেশে রূপান্তরিত বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন অবধি উপন্যাসের ঘটনাস্রোত বিস্তৃত। এমনকি পূর্ব-বাংলার ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, চাটিগাঁ (চট্টগ্রাম) প্রভৃতির পাশাপাশি কলকাতা, ত্রিপুরা, অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত ওয়ালটেয়ার উপন্যাসটির ভৌগোলিক পরিমণ্ডলগত বিস্তৃতিকে নির্দেশ করে। তবে উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্র হল কৃষ্ণনগর। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ইংরেজ শাসনামলের কৃষ্ণনগরের 'টাউন' ও চাঁদ-সড়ক এলাকার বিভিন্ন পাড়া, রাস্তা, বস্তি, পুকুরঘাট, হাটবাজার, লোকালয়, মসজিদ-গির্জা ও সংলগ্ন প্রাঙ্গণ, কামারশালা, অফিস-আদালত, থানা, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলস্টেশনকেন্দ্রিক জনপদের চালচিত্র এতে প্রতিবিম্বিত। ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষ্ণনগরের বাঙালি জনজীবনের রূপরেখা বদলে যাচ্ছিল। বিশেষত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের চাপ ভারতীয় উপনিবেশের অংশ হিসেবে এখানকার বাসিন্দাদের জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। এমনকি রাজনৈতিক সচেতনতার পরিণতিতে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে। নজরুল উপন্যাসটির কুশীলবদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় পরিচয় এবং পেশাগত ভূমিকাকে ভিত্তি করে কৃষ্ণনগরের সমাজকাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা পাঠকের মনে গড়ে তোলার সুযোগ নিয়েছেন। এর উপরিভাগে 'বিধাতা'রূপী ইংরেজ সরকার বা শাসকশক্তির অবস্থান, যার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে গড়ে তোলা হয়েছে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনকাঠামো। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে খ্রিস্টান মিশনারি,[১২] গির্জার পাদরি ও সিস্টার[১৩] স্থানীয় খান বাহাদুর, পাড়ার মোড়ল, মসজিদের মৌলবি প্রমুখ। উপন্যাসটিতে সিভিল

সোসাইটির অংশ হিসেবে বিচারপতি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডেপুটি, দারোগা, রাজনীতিবিদ (কংগ্রেসওয়ালা), ডাক্তার, সরকারি চাকরিজীবী, পুলিশ, গোয়েন্দা, সাংবাদিক, পিয়ন, রেলস্টেশন ও এর কার্যক্রম পরিচালনাকারী বাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। তবে উপন্যাসটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো সমাজকাঠামোর তলদেশবর্তী কায়িক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী, যারা প্রান্তজন হিসেবে স্বাতন্ত্র্যহীন ও বিশিষ্ট পরিচয়বিচ্যুত, পরিণামে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক নিম্নপর্যায়ের এককাতারভুক্ত হয়ে থাকে। তাদের বিপরীতে রয়েছে উচ্চবর্গ ও সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণি। কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক মানুষেরা মুসলমান ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, স্বল্পসংখ্যক হিন্দু। উপন্যাসের শুরুতেই নজরুল কুশীলবদের পরিচয় জানাতে গিয়ে 'নিম্নশ্রেণির মুসলমান'দের পেশা, কর্মপদ্ধতি ও জীবিকানির্বাহরীতি, সামাজিক জীবনযাপন প্রসঙ্গসমূহ উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়, তাদের জীবনধারা বহুলাংশেই পাড়ার মোড়ল ও মসজিদের মৌলবির হুকুমমাফিক প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিকভাবে তাদেরকে পতিত, বিচ্ছিন্ন বা একঘরে, এমনকি জাত খোয়ানোর মতো শাস্তি ভোগ করতে হয়। এছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ওঠাবসা, মেলামেশার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা থাকায় সামাজিক বিভাজন আরো প্রকটিত হয়। নিম্নবিত্তের হিন্দু ও মুসলমানরা যে অভাব-অনটন থেকে বাঁচতে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয় এবং এর পরিণামে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেটিও তাদের জীবনবাস্তবতার অংশ। সার্বিকভাবে, চাঁদ-সড়ক এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জাতি-পেশাগত পরিচয়ে রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চি, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, চাষি, কুলি-মজুর, মেথর, গয়লা, মুর্দাফরাশ, ধাত্রী বা দাই, কামার, নাপিত, ঘরামি, ধানভানানী নারী, সূচিশিল্পী, গৃহপরিচারিকা হিসেবে সামাজিকভাবে পরিগণিত। এ জনপদের জীবনযাত্রা, কর্মপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে নজরুল সমকালীন রাজনৈতিক আখ্যানকে উপন্যাসটিতে যেভাবে সম্পৃক্ত করেছেন, তাতে প্রতীয়মান হয়, অখণ্ড ভারতের নাগরিক হিসেবে তিনি নিজেও তাদের ভাবনালোক ও কর্মকাণ্ডের প্রতি সচেতন ছিলেন। এমনকি এক্ষেত্রে তিনি তাদেরকে সর্বাত্মক সমর্থনও দিয়েছেন, যা এ উপন্যাসে লক্ষণীয়।

১.৩. ঔপনিবেশিকতার দৌরাত্ম্য ও প্রান্তজনের ভোগান্তি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নেতিবাচক অভিঘাত যে জনমানসে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, এর বিভিন্ন ভাষ্যরূপ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। লর্ড কর্নওয়ালিশের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা মজবুত ভিত্তি পেয়েছিল, যা পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে রাষ্ট্রশাসনের সুদূরপ্রসারী অভিপ্রায়ে রূপান্তরিত হয়। সেটি বাস্তবায়নে গড়ে তোলা হয়েছিল আমলাতন্ত্র, প্রশাসনকাঠামো ও বিচারব্যবস্থা। এমনকি আধুনিককালের নগরায়ণের অংশ হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটি, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন, হাটবাজার, পাড়াভিত্তিক বাসস্থান, সংবাদপত্র, থানা, গোয়েন্দা অফিস প্রভৃতি অবকাঠামো স্থাপিত হয়েছিল। তবে এর পাশাপাশি এ উপন্যাসে যে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা জনমানসে জোরালো প্রভাব বিস্তার করেছিল,

সেটি হল খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম। এ উপন্যাসে নজরুল এ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেননি। তবে গির্জা, গির্জার পাদরি বা ফাদার, সিস্টার ও নার্স, কর্মচারীদের উপস্থিতি থেকে এর ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গের 'বাংলার ভিনিস' খ্যাত বরিশালের জমিদারশাসিত গ্রামাবধি মিশনারি কার্যক্রম যে বিস্তৃত, এর বিবরণ উপন্যাসে রয়েছে। কৃষ্ণনগরে খ্রিস্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক (ওমান কাত্‌লি) পাড়া ও প্রোটোস্ট্যান্ট (ছিটেন) পাড়ার পৃথক নামকরণ, জজসাহেব রামপ্রসাদের উল্লেখের পাশাপাশি নিম্নবিত্তের অধিবাসী মধু ঘরামি ও তার চতুর্দশী মেয়ে কুর্শি, প্যাঁকালে, নুলোর মা হিড়িম্বা, পুঁটের মা, মিনতি, মেজো-বৌসহ কিছু অনাম্নী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক কালপর্বে, বিশেষত উনিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে মিশনারি কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুরা নিজ ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক পরিবারসমেত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে নতুন নামে অভিহিত হচ্ছে। তারা পড়াশোনা, চাকরিলাভ ও অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে। এর ফলে আর্থিক অনটন থেকে তাদের মুক্তিলাভ ঘটছে এবং জীবনধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হচ্ছে। মধু ঘরামি ও তার মেয়ে কুর্শির খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের প্রসঙ্গ উপন্যাসে বিবৃত। তা থেকে অনুধাবন করা যায়, কৃষ্ণনগরের অন্তত দুই প্রজন্ম ইসলাম ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ ধারা যে সেখানে সক্রিয়, তা মেজো-বৌ ও প্যাঁকালের ধর্মান্তরিত হবার ঘটনায় বোঝা যায়। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকটি হলো, মুসলমান সমাজে এ ঘটনা যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্ভব ঘটায়। অশিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর, হতদরিদ্র, আর্থিকভাবে নিঃস্বপ্রায় বাঙালি মুসলমানের পক্ষে কায়িক শ্রমজীবী হিসেবে স্বল্প বেতনের কাজে যুক্ত হয়ে পরিবার নির্বাহ করা কতটা কষ্টসাধ্য, তা প্যাঁকালের পরিবারের মাধ্যমে নজরুল দেখিয়েছেন। এ সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে লক্ষণীয়। ধর্মপ্রচারের কৌশলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ অবধি বিস্তারের গোপন অভিলাষ মিশনারীদের কার্যক্রমে লক্ষণীয়। উপনিবেশিতদেরকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক পরিচালনা করার ও অনুগত সেবকে রূপান্তরের প্রচেষ্টা নেপথ্যে সক্রিয় ছিল। যিশুর জয়গানের মাধ্যমে পীড়িতের প্রতি দয়ালু আচরণ ও আর্তকে সেবার ছলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের গতিকে মিশনারি কর্তৃপক্ষ বেগবান করতে বরাবর সচেষ্ট থেকেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্প্রসারণের ভিত্তি মজবুত করতেই উপনিবেশিত রাষ্ট্রসমূহ পরিচালনার অনুষঙ্গে এসব কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের আলোকে বিষয়গুলো সম্পর্কে নজরুলের সচেতনতার পরিচয় মেলে। প্যাঁকালের মেজো-ভাবী ধর্মান্তরিত হবার পূর্বেই মধু ঘরামি ও তার মেয়ে কুর্শি, হিড়িম্বা, পুঁটের মা ও অন্য মেয়েদের খ্রিস্টান হবার বৃত্তান্ত উপন্যাসে অনুপস্থিত থাকলেও তাদের আচরণে, মেলামেশায়, সংলাপে এ বিষয়ক উল্লেখ লক্ষণীয়। বিধবা রূপবতী মেজো-বৌ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে চায়নি। কিন্তু পারিবারিক অনটন, দারিদ্র্যময় জীবনের বিভীষিকা ও ছেলেমেয়ের অনাহার দিনের পর দিন সহ্য করতে না পারার পাশাপাশি সেলাই ও পড়ালেখা শিখে স্বাবলম্বী হবার সুযোগলাভ—

প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। নজরুল জানিয়েছেন, ভারতে 'মিশনারিরা ওদের ধর্ম প্রচারের জন্যে হয়ত একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্মে দীক্ষিতও করতে পেরেছে' (রফিকুল, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮)। এর রূপায়ণ ঘটেছে প্যাঁকালের মেজো-ভাবীর ক্ষেত্রে। সেজো-বৌ ও তার দুমাস বয়সী নবজাতকের অসুস্থতার প্রতিকারার্থে মিশনারির একজন পাদরি সাহেব ও একজন ইংরেজ নার্স মিস জোন্স তাদের বাড়িতে আসে। খোঁজখবর নিয়েই তারা এখানে এসেছিল, উপযাচক হয়ে সাহায্য করার জন্য। এমন ঘটনার জন্য প্যাঁকালের পরিবার প্রস্তুত ছিল না। প্যাঁকালের মা হতভম্ব হয়েছিল ঘটনাটি বুঝে উঠতে গিয়ে, বৌঝিরা সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। মিশনারিদের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য পূর্ব থেকে বুঝে ওঠার সাধ্য তাদের ছিল না। শাসক বা তার প্রতিনিধি যখন শাসিতের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে তার আন্তরিকতা প্রকাশ করতে চায়, এর অন্তরালে যে গুপ্ত অভিসন্ধি থাকতে পারে, তা প্রায় নিরক্ষর, অসচেতন আমজনতার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। উপনিবেশ স্থাপনকারী ও তাদের প্রতিনিধিরা এ বিষয়টি খুব ভালোভাবেই জানত, উপনিবেশে আধিপত্য বিস্তার করতে হলে উপনিবেশিতদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্তে এ পরিকল্পনারই প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতার প্রকাশ ঘটেছিল। শিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়কে বুঝে উঠতে ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদেও প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা শেখানোর আয়োজনে সেই কলেজের কর্মকাণ্ড ইতিহাসে লিখিত রয়েছে। এদিকে সমাজের বৃহৎ অংশ অর্থাৎ তলদেশের দরিদ্র প্রান্তবাসীকে বশীভূত করতে তাদের মাতৃভাষা আয়ত্ত করা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, সেবার বন্দোবস্ত ও বাইবেলের দোহাই দিয়ে যিশুর মাহাত্ম্য প্রচার– প্রভৃতিই ছিল মিশনারির পরিকল্পিত ভাবনা। প্যাঁকালের মা পাদরি সাহেবের মুখে সাধুরীতির ভাঙা বাংলায় সাহায্যের কথা শুনে, আবেগায়িত কণ্ঠে নতজানু ভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা জানায়– 'খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব। ঐ আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভালো করতে পারো। কেনা হয়ে থাকব তাহলে' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৩০)। পাদরি হলেও সাহেব যেহেতু নামকরা ডাক্তার, তাই তার পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পরিবারটি রাজি ছিল। খ্রিস্টানের ছোঁয়া গ্রহণ করবে না, তার অর্থ সাহায্য নেবে না, এরূপ মনোভঙ্গি তাদের আচরণে প্রকাশিত হয়নি। বরং অযাচিতভাবে মিশনারির এ সাহায্য প্রাপ্তিকে তারা দুর্দিনের পরম সহায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সাহেবের নিকট থেকে যিশুর ভরসায় সুস্থ হয়ে ওঠার শুভকামনা শুনে, নার্সের মাধ্যমে শারীরিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ও ঔষধ গ্রহণ করে, এরপর বিকেলেও সেজো-বৌ ও খোকাকে পুনরায় দেখতে আসার প্রতিশ্রুতি জেনে ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে পরিবারটির দুর্ভাবনা অনেকটাই কমেছিল, যদিও মেজো-বৌ বিষয়টিকে অন্যভাবে বিবেচনা করেছিল–

> মেজো-বৌ কাঁদতে লাগল, 'কপালে এত দুক্ষুও লিখেছিলেন আল্লা। সেজো-বৌয়ের যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা দিতে পারলুম না। শুকিয়ে

মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াতকুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৩১)

এভাবেই নিম্নবর্গের বাসিন্দাদের নিকট মিশনারি কার্যক্রম গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যার ফলশ্রুতিতে দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুরা পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। পেটের ক্ষুধা মেটানো, পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ ও অসুস্থ স্বজনদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা, পড়ালেখার সুযোগ গ্রহণ ও তা কাজে লাগিয়ে চাকরি বা স্বাবলম্বী হবার উপায় করে নেয়া– এসব প্রাপ্তির প্রলোভন এড়ানো তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীরা যখন তাদের রোগে-শোকে খোঁজখবর নিতে অনীহ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে অনাগ্রহী। ফলে অসুস্থ সেজো-বৌ ও তার খোকার সেবার জন্য মিশনারি পাদরি ডাক্তার ও নার্সের শ্বশুরবাড়িতে আগমনই মেজো-বৌকে খ্রিস্টান মিশনারির প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে মিস জোন্সের অতি উৎসাহ মেজো-বৌকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, তাকে পড়ালেখা শেখানোর জন্য সুচতুর এ ইংরেজ নার্সের কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পরবর্তীকালে মেজো-বৌয়ের নিকট উন্মোচিত হয়। দরিদ্রদের সেবা দিয়ে, আর্থিক সহায়তা করে, লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার অন্তরালে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও পারিবারিক গণ্ডি, সামাজিক বন্ধন থেকে ছিন্ন করার কূট অভিপ্রায় যে সন্নিহিত রয়েছে মিস জোন্সের আচরণে, উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনায় নজরুল সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুভাষণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অসহায়-দরিদ্রদের মনোযোগ আকর্ষণ, এরপর বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের পর তাকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এবং পরিণতিতে তাকে নিজ পরিবার ও অঞ্চল থেকে, এমনকি নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অচেনা জনপদে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব প্রদান– এ ছকেই মিশনারি মেজো-বৌকে 'হেলেন' নামকরণের মাধ্যমে একবছর যাবত কৃষ্ণনগর থেকে সরিয়ে বরিশালে প্রায় নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করে। মিস জোন্সের মতো সিস্টারদেরকে কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী 'মিসবাবা' সম্বোধন করে। বিবাহিত বা অবিবাহিত যে নারীরা কোনো কারণে সংসারযাপনে অনাগ্রহী, মিশনারিতে যুক্ত হলে তাদেরকে যিশুখ্রিস্টের মাহাত্ম্য বন্দনাপূর্বক খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়, অনুসারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির তাগিদে। এ কাজ এগিয়ে নিতে মিস জোন্স স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে। মিশনারি কার্যক্রমের প্রভাব জনসমাজে বাড়তে থাকে। এর ফলে পাড়ার মুসলমান ছেলেরা খ্রিস্টান ছেলেদের দেখাদেখি গান গায়– 'আমরা যিশুর গুণ গাই' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১০)। অন্যত্র ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, প্যাঁকালের সঙ্গে কলহের পর সে বাড়ি ছেড়ে রানাঘাট চলে যাওয়ায় তার খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত অভিমানিনী প্রেমিকা কুর্শির মনে হয় 'সন্ধ্যা নেমে আসে– তাদের গির্জার কালো পোশাক-পরা মিসবাবাদের মত' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৪০)।

মিসবাবা মিস জোন্সের একাধিকবার প্যাঁকালেদের বাড়িতে যেচে হাজির হয়ে অসুস্থ সেজো-বৌ ও তার ছেলের জন্য ঔষধ-পথ্য দিয়ে আসার অন্তরালে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো, মেজো-বৌয়ের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে তাকে মিশনারিতে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। মেজো-বৌ মিস জোন্সের প্রস্তাব গ্রহণে সম্মতি দিলেও দোদুল্যমানতা তাকে গ্রাস করেছিল। কারণ পরিবারে ও সমাজে এ ঘটনার জেরে বিভিন্ন ঝামেলার সম্ভাবনা ছিল। তবু সে মিস জোন্সকে ফিরিয়ে না দিয়ে বরং মিশনারিতে যাবার সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। কারণ তাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে না, এটিই ছিল তার ভরসাস্থল। শাশুড়িকে এড়িয়ে বড় জাকে সে বিষয়টি জানায়। যদিও এতে তার সম্মতি ছিল না, 'কত বড় দুঃখে পড়ে মেজো-বৌ আজ মিস-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তাও তার অজানা ছিল না' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৪৫)। মেজো-বৌ পাড়া সন্নিকটবর্তী গির্জার দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রবল অপরাধবোধে তাড়িত হচ্ছিল। কারণ 'হঠাৎ তার মনে পড়ল তারই বাড়ির পাশের মসজিদের আজান-ধ্বনি। ... সে পাপ করছে– অতি বড় অন্যায় করছে, এর ক্ষমা নাই, এর ফল ভীষণ, তাকে অনন্তকালের জন্য অনুতাপ করতে হবে' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৪৪)। এ গ্লানিবোধ ও দ্বিধা থেকে অচিরেই সে মুক্ত হয় মিস জোন্সের সঙ্গে আলাপচারিতায়। দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন। তবে নির্মম বাস্তবতার অভিঘাত ও প্রাত্যহিক টানাপোড়েনের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ বিধায় সে মিস জোন্সের স্নেহানুভবে বিগলিত হয়। কারণ ইতঃপূর্বে কেউ তাকে এত আপন ভাবেনি, তার সংসারযাত্রার অজস্র প্রতিবন্ধকতামোচনে এগিয়ে আসেনি। তবে এ ঘটনাটি অচিরেই জানাজানি হয়ে গেলে শাশুড়ির সঙ্গে তার দ্বৈরথ প্রবল হয়ে ওঠে। 'শাশুড়ি শিলাবৃষ্টির মেঘের মতো মুখ করে রান্নাঘরের সামনে বসে বোধহয় মেজো-বৌয়েরই প্রতীক্ষা করছিল। ... ঝড়, বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতোই বেগে চিৎকার, কান্না ও গালি চলতে লাগল। মেজো-বৌ চুপ করে শুনে যেতে লাগল' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৪৭)। মেজো-বৌ ব্যক্তিত্বময়ী, বিচক্ষণ, আত্মমর্যাদাসচেতন নারী। তাই সে নিজের ও ছেলেমেয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জেরে অবশেষে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। নিরাপত্তা, সম্মানজনক জীবন যাপনের প্রত্যাশা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করতে তাকে ধর্মান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশেষত, পরিবার ও সমাজ যেহেতু মিশনারির কর্মকাণ্ডকে মেনে নিতে অসম্মত, তাই কুড়চিপোতার বাপের বাড়ি বা চাঁদ-সড়কের শ্বশুরবাড়িতে সে আশ্রয় নিতে চায়নি। মিস জোন্সের উপযাচকসুলভ ভূমিকা ও লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন মিলেমিশে মেজো-বৌকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিজ ধর্ম পরিত্যাগে। ধর্মের বিধান বা ধর্মপতিদের চোখরাঙানি, কোনোটিই তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। নিজের মতো করে চলতে সে ভালোবাসে। তাই তো শাশুড়ি যখন তাকে মানা করত গুনগুন করে গান গাইতে, অথবা স্মরণ করিয়ে দিত প্রতিদিন নামাজ না পড়লে গুনাহের ভাগিদার হতে হবে, তবু সে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়নি। একারণেই মিস জোন্সও তাকে মিশনারির সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ নিয়েছিল। 'মিস জোন্সের কি জন্য জানি না, প্রথম দেখাতেই মেজো-বৌকে চোখে ধরে গেছিল। শুধু চোখে নয়, হয়তো মনেও। ... ওকে

একবার দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮)। মিস জোন্সের গরজের চেয়ে বরং পাড়ার লোকের কুৎসা, অপবাদ ও অসদাচরণের প্রতিক্রিয়াতে অতিষ্ঠ হয়েই মেজো-বৌ খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেছিল। লতিফা আনসারকে জানিয়েছিল– 'পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খ্রিস্টান হলো। ... ও মেমসাহেবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করত বলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে বলে কেবলি ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে ... বদনাম দিতে লাগল' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬০)। এ সুযোগই কাজে লাগায় মিস জোন্স। কারণ সে ইতঃপূর্বে বলেছিল, মেজো-বৌকে মিশনারিতে পাকাপাকিভাবে যেতে এবং খ্রিস্টান হতে হবে না। প্রতিদিন কিছুটা সময় মিশনারিতে গিয়ে মিস জোন্সের কাছে লেখাপড়া ও সেলাই শেখায় অতিবাহিত করলেই হবে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেহেতু মেজো-বৌ পরিবার ও সমাজের সঙ্গে লড়াইয়ে বিপন্নপ্রায়, তাই সে আশ্রয় হিসেবে মিশনারিকেই বেছে নিয়েছিল নিজের ও ছেলেমেয়ের নিরাপত্তা-আশ্রয়ের জন্য। ফলে মিস জোন্স মেজো-বৌকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ পায়।

রাজনীতিসচেতন শ্রমিকনেতা আনসার তার বোনজামাই নাজির সাহেবকে মিস জোন্স সম্পর্কে বলেছিল, 'ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। ... ওদের নখ-দন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্তামিকে। মিশনারির মেম' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬১)। মেজো-বৌও অচিরেই মিস জোন্সের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হতে দেখে। আনসার মেজো-বৌর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খ্রিস্টান হবার কারণ জানতে গির্জায় গেলে পাদরি তাকে জানায়, 'আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভূটপূর্ব মেজো-বৌকে ... স্বয়ং ঈশ্বর সটপঠে ডাকিয়েছেন। আমরা কেহ নয়' (ইসলাম ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬২)। মেজো-বৌ যে সমাজের চাপে পড়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান হয়েছে, বিষয়টি জেনে আনসার সন্তুষ্ট হয়। তাই সে প্রত্যাশা করে, মেজো-বৌকে যেন মিশনারিরা মানবকল্যাণের পথে সংযুক্ত করে। এই অপ্রত্যাশিত সমর্থনের প্রত্যুত্তরে মিস জোন্স ও পাদরির জবাব ছিল– 'মানুষেরই মুকটির জন্যেই তো আমাদের যিশু প্রেরণ করেচেন। আপনায় ডেন্যবাড, আমরা খ্রিস্টান হবার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেখাচ্ছে' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬৪)। আনসারকে মেজো-বৌ জানায়, 'ওদের (ছেলেমেয়ে) উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬৫)। পিতৃহীন ছেলেমেয়ের জঠরজ্বালা মেটাতে মেজো-বৌ ধর্মান্তরের ব্যাপারে দ্বিধাহীনভাবেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছিল। তাই বিদায়কালে আনসার তার ছেলেমেয়েকে খাবার কেনার জন্য দুই টাকা দিলে মিস জোন্স ও পাদরি সাহেব ব্যাপারটি মেনে নিতে পারে না। পাদরি সাহেব তাদেরকে ধমকের সুরে হুকুম দেয় টাকা ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু মেজো বৌ সে আদেশ অগ্রাহ্য করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আনসারকে এগিয়ে দিতে রাস্তায় আসে। ফলে 'পাদরি সাহেব বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিস জোন্সকে ইঙ্গিতে ডেকে বহু পরামর্শের পর স্থির হল, মেজো-বৌকে শিগগিরই অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে'

(রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬৬)। এভাবেই উন্মোচিত হতে থাকে মিশনারির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথাকথিত মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের স্বরূপ। মেজো-বৌ মিশনারিতে সংযুক্ত হলেও চাঁদ-সড়কেই ছিল। এবার তাকে ছেলেমেয়ে ও পরিবারকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে, এরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অকুতোভয় মানসিকতাকেই তারা বাধা হিসেবে বিবেচনা করে। পরদিন মেজো-বৌ আনসারকে বিষয়টি জানায়। 'আমার যা করবার, তা তো এখন ঠিক করে দেবে ঐ সাহেব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধহয় বরিশাল বদলি করবে' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৬৬)। এ সংলাপ থেকে বোঝা যায়, মিস জোন্সের সদাচরণ, পাদরির শুভকামনা ও মিশনারির কর্মকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে ক্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার অংশ। উপনিবেশবাসীকে শিক্ষিত হবার সুযোগদান, খাবারপ্রাপ্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও নিতান্তই কর্মী হিসেবে তাদেরকে দিয়ে সেবা আদায় করানোর উদ্দেশ্যপ্রণীত। যিশুর নামে মানবকল্যাণ প্রচারের অন্তরালে কায়েমিবাদী স্বার্থ বাস্তবায়নে মিশনারি সক্রিয়। কিছুদিন পর পুলিশবাহিনী যখন রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত আনসারকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় রানাঘাট রেলস্টেশনে হাজির করে, সেখানে নাটকীয়ভাবেই মিস জোন্স, প্যাঁকালে, কুর্শি ও মেজো-বৌকে সে দেখতে পায়। তাকে দেখে মিস জোন্স হেসে এগিয়ে আসে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে, অথচ মুখে বলে, 'আপনার এ অবস্টা ডেখে দুঃখিট, মিস্টার আনসার' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৭২)। কিছুদিন পূর্বেও গির্জার ঘটনাটি সে যে ভুলতে পারেনি, তা তার এ সংলাপে ও হাসিতে ইঙ্গিতবহ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় আনসার যে অভিযুক্ত অপরাধী হিসেবে জনসম্মুখে হাজির হয়েছে, এ ব্যাপারটিই সম্ভবত মিস জোন্সের হাসির উদ্রেকের কারণ। আনসার ব্যাপারটি পাত্তা না দিয়ে মিস জোন্সের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে–

> বরিশালে! আপনাদের মেজো-বৌ তো কাল বেঁকে বসেছিল সে আর গির্জায় থাকবে না। আবার মুসলমান হবে, ঘরে ফিরে যাবে। সে কি কান্না, মিস্টার আনসার। কিন্তু আজ সকালেই দেখি, এসে বললে– সে এদেশে থাকতে চায় না! আজ কিন্তু সারাদিন কেঁদেছে ও! ওর মাথায় বোধ হয় ছিট আছো, মিস্টার আনসার! হাঁ, আর আপনি শুনে বোধহয় খুশি হবেন, কাল প্যাঁকালেও আমাদের পবিত্র ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কুর্শির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। যিশুখ্রিস্ট ওদের সুখী করুন। গুড বাঈ (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৭২-৩৭৩)।

মিস জোন্সের এ বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হল, মেজো-বৌয়ের সন্তান-পরিবার-সমাজ ছেড়ে বরিশাল যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবল দ্বিধার বিষয়টিকে মিস জোন্স তার দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এর সমর্থনে তার কান্নাকাটির ব্যাপারে অধিক জোর দিয়েছে। এর মাধ্যমে সে বোঝাতে চায়, মেজো-বৌকে নিয়ে যে মর্যাদাব্যঞ্জক, সমীহসূচক

ধারণা পাড়ার বাসিন্দাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত. প্রকৃতপক্ষে সে এর যোগ্য নয়। এমনকি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পরও সে আবার মুসলমান হবার ইচ্ছা জানালে মিস জোন্স এতে ক্ষুব্ধ হয়। তাই সে ইচ্ছাকৃতভাবেই 'আপনাদের মেজো-বৌ' সম্বোধনটি করে। এর সমান্তরালে প্যাঁকালের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ, কুর্শির সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হওয়া ও তাদের বরিশালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় সে খুশি ছিল। এক্ষেত্রে সে 'আমাদের পবিত্র ধর্মে' বিশেষণ প্রয়োগে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচারে সচেষ্ট। এ ঔপনিবেশিক অপরতাবোধ স্পষ্টই উপনিবেশিতের প্রতি উপনিবেশকের প্রতিনিধিদের বিরূপ মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ।

রানাঘাট স্টেশনে ট্রেন চলে এলে মেজো-বৌ আনসারকে দূর থেকে দেখতে পায়। কিন্তু সে শৃঙ্খলিত ও পাহারারত বিধায় কাছে আসার সুযোগ না থাকায় তাদের আলাপ হয়ে ওঠে না। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ় অনুভব যে রাজনৈতিক ঘনঘটা ও মিশনারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তা মেনে নেয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। কারণ মন থেকেই তারা পরস্পরের প্রতি আকুলতা প্রকাশ করেছিল, যা উপন্যাসের বিবিধ বয়ানে প্রকাশিত। এটিই তাদের শেষ সাক্ষাৎ দৃশ্য, যেখানে জীবনের বিবিধ জটিলতার পরিণতিতে তাদের মিলন অধরাই থেকে যায়। এ দুটি চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা রূপায়ণে দৃশ্যটি তাৎপর্যবহ, একইসঙ্গে যেটি শাসক-শাসিতের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ট্রেন এসে পড়ল। আনসার দেখতে পেল, ইনজিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে। মৃত্যু-ক্ষুধার মতো সে চাউনি জ্বালাময়, বুভুক্ষু, লেলিহান। সে চোখে অশ্রু নাই, শুধু রক্ত। ... ট্রেন ছেড়ে দিল। আনসার তার চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্লাটফর্মে, কাকে যেন অনেকগুলো লোক আর মিস জোন্স ধরাধরি করে তুলছে। ... রেলগাড়ির ধোঁয়ায় আনসারের চোখ এবং প্লাটফর্ম সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৭৩)।

এ উদ্ধৃতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গটি হলো ট্রেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আবিষ্কৃত ও প্রতিনিধিত্বমূলক এ যন্ত্রটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। ভারতবর্ষে উনিশ শতকের মাঝামাঝি রেললাইন স্থাপন ও ট্রেন চলাচলের বন্দোবস্ত বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল। এর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভারতীয় জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশাল ভৌগোলিক পরিসরে বিন্যস্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অধিক পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য, রসদসামগ্রী, মালামাল প্রভৃতি পরিবহন ও জনগণের যাতায়াতের বন্দোবস্ত অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, দ্রুতগামী করার অভিপ্রায়ও এক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। প্রথমে বাষ্পীয় ও এরপর ইঞ্জিনচালিত ট্রেনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার অন্তরালে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্য

বিস্তারের পায়তারা শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করেছিল। ভারতীয় কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ, কলকারখানায় উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী রফতানির ক্ষেত্রেও ট্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতের অপেক্ষাকৃত ধীরগতির কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনধারায় ব্রিটিশ শাসনপর্বে পুঁজিনির্ভর সভ্যতার বাহনরূপী রেললাইনভিত্তিক ট্রেন চলাচলের বন্দোবস্ত প্রবল গতিময়তার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। আনসার ও মেজো-বৌয়ের শেষ সাক্ষাৎ রানাঘাট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আয়োজনের মাধ্যমে নজরুল ভারতীয় জনজীবনের বিভঙ্গতা ও আন্তঃসম্পর্কের ছেদসূচক ইঙ্গিতদানে সচেষ্ট। ট্রেন চলাচলকারী রেললাইনের দুই বাহুর অবিরাম সমান্তরালতার মতোই আনসার ও মেজো-বৌয়ের জীবনের পথ মিলিত না হয়ে বরং বিচ্ছেদের আশঙ্কাসূচক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ও রাজবন্দি আনসারের রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধানের সমান্তরালে মিশনারি কর্তৃক ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান মেজো-বৌয়ের বরিশালের উদ্দেশ্যে সন্তান-পরিবারছিন্ন নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা ভালোবাসার মোহনায় তাদের পৌঁছানোর সম্ভাবনাহীনতাকেই প্রকটিত করে।

১.৪. ঔপনিবেশিকতার বিবিধ নেতিবাচক অভিঘাত: উপনিবেশিতদের অপরতাবোধের স্বরূপ

অপরতাবোধের বিস্তার উপনিবেশে প্রকটিত হতে থাকে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনে, যেখানে উপনিবেশিতকে বিবিধভাবে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের অভিসন্ধি শাসকগোষ্ঠীর প্রকাশ্য ও গোপন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপরিহার্য অংশ। জাতি-সংস্কৃতিগতভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার অন্তরালে উপনিবেশের বাসিন্দাদের অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল বিবেচনাপূর্বক তাদেরকে উন্নত, গ্রহণযোগ্য, রুচিশীল জীবনযাত্রার অংশীদার করার প্রলোভন শাসকের কৌশলবিশেষ। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম ও একে বৈধতাদানের উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। ভিন্ন রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তার অনুসারী, স্বকীয় ভাষানুসারী জনগোষ্ঠীর ওপর সর্বাধিপত্য বিস্তার ও তাদের দেশ দখলের অংশ হিসেবে ঔপনিবেশিক শক্তি বরাবর স্বীয় জাতিগত উচ্চমন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে উপনিবেশিতদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, উপনিবেশিতদেরকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, তাদের নিজস্বতা ও সৃষ্টিশীলতা অস্বীকার করা, এমনকি ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ভাষিক উৎকর্ষ বিলোপসাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা– প্রভৃতির মাধ্যমে উপনিবেশিতদের সমষ্টিচেতনায় অপরতাবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় এসব বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় উপনিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে অপরতাবোধের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়, জাতি-সম্প্রদায়কেন্দ্রিক সংহতি ও গোষ্ঠীচেতনার বিনাশ ঘটে। নিচে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তযোগে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের আলোকে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

১.৪.১. জাতপাত ও ধর্মীয় বিভাজনগত অপরতাবোধ

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের শুরুতেই ছুৎমার্গ বা জাতপাতগত-ধর্মীয় বিভাজনগত অপরতাবোধের প্রতিফলন লক্ষণীয়। যেমন: কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক মুসলমান ও হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে খ্রিস্টান হিসেবে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাদের সমষ্টিচেতনায় যে ভাবনার প্রভাব এক্ষেত্রে প্রবল, তা হলো– ইংরেজরাজ হলেন ব্রিটেনের অধিপতি, তিনি ধর্মীয়ভাবে খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা হলো রাজার জাত, একারণে তারা জাতিগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তারাই দেশ পরিচালনা করে, জজসায়েব হয়, এদেশে মিশনারির মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করে, জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। এমনকি তাদেরকে বিভিন্ন চাকরি দেয়, কাজের বন্দোবস্ত করে। তাদের অধীনে থাকলে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে মুক্তি মিলবে। অধিক উপার্জনের মাধ্যমে পরিবার চালানো যাবে, রোগে ভুগে মৃত্যুবরণের পরিবর্তে ওষুধ-পথ্যের সাহায্য পাওয়া যাবে। এরূপ ধারণা যে কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, এর সাক্ষ্য রয়েছে উপন্যাসের শুরুতেই। চাঁদ-সড়ক এলাকার 'ওমান কাত্‌লি' পাড়ার নারীরা কলতলায় কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে কলহে লিপ্ত হয়। জাতপাতগত ছোঁয়াছুঁয়ি, ছুৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজে বহুকাল যাবত সক্রিয় ছিল। কালিক প্রবাহে এটি মুসলমান সম্প্রদায়ে বাহিত হয়েছে। লৌকিক অনুশাসনের অংশ হিসেবে এর বিস্তার নেতিবাচকতা সৃষ্টি করলেও সমাজ থেকে তিরোহিত হয়নি। বরং কূপমণ্ডুক, রক্ষণশীল, গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরা মোল্লা-মৌলবি, পাড়া-মহল্লার মোড়ল ও সমাজপতিরা একেই হাতিয়ার করে স্বীয় সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকে। অথচ ইসলাম ধর্মে অস্পৃশ্যতা, জাতপাতগত বিভেদের স্থান নেই। উপন্যাসের বিবরণে লক্ষণীয়, অতীতে মুসলমান বা হিন্দু ছিল এবং বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, এমন দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকজন নারীর মধ্যে বিবাদের কারণ হলো কলতলায় জনৈক খ্রিস্টান মেয়ে কলসিতে জল নিতে গিয়ে হয়ত অসচেতনভাবে বা ভুলক্রমে কোনো মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। তাদের মতে, এর ফলে জাত খোঁয়ানোর ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনাকে ভিত্তি করেই মুসলমান প্যাঁকালের মার সঙ্গে খ্রিস্টান নুলোর মা হিড়িম্বার কলহ বাঁধে। এতে যুক্ত হয় উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা। ঝগড়ার উপলক্ষ্য হিসেবে খ্রিস্টান জজসাহেব রামপ্রসাদ বাবুর বাড়িতে বাবুর্চিগিরির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকে হারাম হিসেবে ঘোষণার বিষয়টি সামনে আসে। হিড়িম্বা অভিযোগ করে, প্যাঁকালের মার বড় ছেলে সোভান যেহেতু রামপ্রসাদ সাহেবের বাড়িতে বাবুর্চিগিরির কামাই দিয়ে সংসার চালায়, কাজেই তা হল হারাম উপার্জন। 'ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে বিনা' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৪)। এর জবাবে পাড়াতে 'কুঁদুলি' (কোন্দলে পটু যে নারী) হিসেবে পরিচিত প্যাঁকালের মা জানায়, তার ছেলে খ্রিস্টানের বাড়িতে বাবুর্চিগিরি করে না, সে ইংরেজ জাতের অন্তর্গত খ্রিস্টান জজসাহেবের চাকরি করে। এভাবেই ছেলের বাবুর্চিগিরিকে সম্বলপূর্বক নিজেকে ইংরেজের কাতারভুক্ত করে সে হিড়িম্বার ওপর দাপট

দেখাতে সচেষ্ট থাকে। তবে তাতে পুঁটের মা বিরোধিতা করে। কারণ 'ঐ জজ সায়েবও আমাদের জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫)? তার যুক্তি হলো, যেহেতু জজ সায়েবও খ্রিস্টান ও রাজার জাত, সেকারণে সে, হিড়িম্বা এমনকি অন্য খ্রিস্টানরাও একই জাতভুক্ত। এভাবেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনাগত অপরতাবোধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর থাকে। উপনিবেশিতদের এই ভ্রান্তিকর মানসিকতা বিস্তারে উপনিবেশকরাই নেপথ্য ভূমিকা পালন করে, যেখানে রয়েছে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবসভ্যতার জন্য সবচেয়ে উপকারী, আদর্শবাদী হিসেবে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নহীনভাবে উপস্থাপনের অপপ্রয়াস। এর পরিণামে উপনিবেশিতদের মধ্যে যে জাত-সম্প্রদায়গত বিভাজন সৃষ্টি করা সম্ভব, তা নজরুল সুচারুভাবে দেখিয়েছেন এ উপন্যাসে। " 'দু-তিনটি ক্রিশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা বলেছিস মাসি' " (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫)। প্রতিপক্ষকে বাক্যবাণে বশীভূত করার পাশাপাশি গালাগাল করা, বাকপটুতায় আক্রমণ করা এবং বিবাদে উসকানি দেয়া প্রভৃতিও ধর্মীয়-সম্প্রদায়গত অপরতাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

জনসম্মুখে নোংরা গালিগালাজে পরস্পরকে সম্বোধন প্রান্তিক নারীসমাজের কলহের অপরিহার্য অংশ। প্যাঁকালের মা হিড়িম্বাকে 'ওলো আগ-ধুমসী (রাগধুমসী)! ওলো ভাগলপুরে গাই' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৪) সম্বোধন করায় প্রত্যুত্তরে বিশালদেহী হিড়িম্বা তার চুল খুলে দিয়ে 'এলোকেশী বামা' হয়ে মুসলমান খাতুনের মাকে 'উঝড়োখাগী! তবু যদি ভাতারের ধুমসুনি না খেতিস দুবেলা' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫) বাক্যবাণ ছুঁড়ে এরপর প্রতিপক্ষ প্যাঁকালের মাকে আক্রমণ করে– 'তুই যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি! ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবী সায়েব নাকি লা? হাত শোঁক, এখনো খেরেস্তানের গন্ধ পাবি' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫)। ইতঃপূর্বে রামপ্রসাদ বাবুর বাড়িতে সোভানের বাবুর্চিগিরির ইঙ্গিত দিলেও এবার স্বয়ং প্যাঁকালের মাকেই হিড়িম্বা অভিযুক্ত করে একই কাজের দায়ে। পরিণামে মুসলমান হয়েও খ্রিস্টানবাড়িতে রান্নার ঘটনার তার জাত যে খোয়া গেছে, এটিই হিড়িম্বার বক্তব্য। তার অভিযোগে বশীভূত হবার পরিবর্তে প্যাঁকালের মা এবার রামপ্রসাদ বাবুর বাড়ি থেকে হিড়িম্বার চাল চুরি করে ধরা পড়ার পরিণতিতে জুতোপেটার শিকার হবার ঘটনা জানিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে। এর পাশাপাশি জাত খোঁয়ানো বিষয়ক হিড়িম্বার কদর্য অভিযোগ থেকেও সে নিজেকে মুক্ত করে–

> বলি ওলো হুতমোচোখি, ঐ 'আমফেসাদ' বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও

বাড়িতে? বলুক দেখি কোন কড়ই রাড়ি বলবে!' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫)।

খ্রিস্টান বাড়িতে রান্না করা যাবে, কিন্তু সেই বাড়ির পানি পান করলে জাত যাবে– এরূপ বিধান অযৌক্তিক হলেও বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত, যা উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহে লক্ষণীয়। ধর্ম, সম্প্রদায়গত বিভাজন সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের অপরতাবোধ ঔপনিবেশিক সমাজে বিস্তারলাভের কারণগুলো হলো ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, পশ্চাৎপদ মানসিকতা, দারিদ্র্যগত টানাপোড়েন, রক্ষণশীল জীবনদৃষ্টি, শিক্ষাগ্রহণের অসামর্থ্য প্রভৃতি। সেকারণেই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ভারতবর্ষের বিপুলসংখ্যক উপনিবেশিতকে প্রায় দুই শতক যাবত শোষণশৃঙ্খলে অবরুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, যা নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন। উপন্যাসের শুরুতেই আংশিকভাবে এসব প্রসঙ্গের অবতারণাকল্পে তিনি উপনিবেশবাসীর সমষ্টিচেতনার রূপরেখা বিষয়ক ধারণাপ্রদানে তিনি সচেষ্ট থেকেছেন।

জাতপাতগত বিভাজন যে ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুসারীদের মধ্যে অপরতাবোধের উদ্ভব ঘটায়, তা এ উপন্যাসে একাধিক প্রসঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম সম্পর্কে চাঁদ-সড়ক এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপতা সঞ্চারেও অপরতাবোধের প্রভাব লক্ষণীয়। দরিদ্র বাসিন্দাদের আর্থিক সহায়তা ও ওষুধ-পথ্য সেবা, পড়ালেখা শেখানো ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করা– এসব কার্যক্রম পাড়ার মৌলবি ও মুসলমান মোড়লের নিকট স্বীয় ধর্মবিরোধিতার নামান্তর। সেকারণেই খ্রিস্টানের ছোঁয়া অশুচি, তাদের দেয়া খাবার খাওয়া যাবে না, খেলে জাত যাবে, এরূপ হুমকি প্রদানের ঘটনায় মুসলমানদের কোণঠাসা অবস্থান যেমন প্রকটিত হয়, তেমনিভাবে প্রান্তজনের মধ্যে ধর্মান্তরের প্রতি আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, অন্নসংকট ও দারিদ্র্যগত পীড়ন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তাদের কেউ কেউ মিশনারি কার্যক্রমে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মেজো-বৌ ধর্মান্তরিত হতে অনাগ্রহী ছিল। তবে মিস জোন্সের কাছে পড়ালেখার সুযোগ গ্রহণ ও ছেলেমেয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা ভেবে গির্জায় যায়। সেখানে মিস জোন্স তাকে চা পানের আমন্ত্রণ জানালে জাত যাওয়ার শঙ্কায় সে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে– 'আমাদের মৌলবি সাহেব আর মোড়ল তো অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানদের ছোঁওয়া খাওয়ার জন্যে!' মেম সায়েব ... ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বিস্কুট হাতে দিয়ে বলল, 'এডের আমি চা খাওয়ালে ডোষ হবে না টো?' ... ওরা এখনো মুসলমান-খ্রিস্টান কিছু নয়– ওরা শিশু' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৪৬)।

ছেলেমেয়ে ক্ষুধার্ত থাকায় মেজো-বৌ সমাজের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে তাদেরকে বিস্কুট খেতে বলে। নজরুল দেখিয়েছেন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন কখনো বাধা নয়। বরং সুবিধাবাদী ব্যক্তি, চক্রই ধর্মকে নিজেদের আখের গোছাতে

ব্যবহার করে, স্বার্থ হাসিলই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম ধর্মে সকল মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি, সেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিভাজন ইসলাম ধর্মে অস্বীকৃত। অথচ সুবিধাবাদী মৌলবিরা একদিকে বিভাষী-বিজাতির প্রতি বিরূপ, অন্যদিকে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ গ্রহণের জন্য এভাবেই অপরতাবোধের বিস্তার ঘটায়। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো মেজো-বৌয়ের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে পাড়ার বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ। সেজো-বৌ ও তার নবজাতকের অসুস্থাবস্থায় মিস জোন্সের তাদেরকে দেখতে এসেছিল। শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্নপূর্বক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে একপর্যায়ে মেজো-বৌয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। গির্জায় পড়ালেখা শেখানোর সুযোগ করে দেয়ায় সেখানে নিয়মিত যাতায়াতসূত্রে তাদের মেলামেশাকে পাড়ার লোকজন সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই মেজো-বৌকে জড়িয়ে বিভিন্ন রটনা সমাজে ছড়ানোর একপর্যায়ে সে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় “পাড়ার পুরুষ-মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগিরা মেজো-বৌকে ‘আড়কাঠি’ করে সব বৌ-ঝিকে ‘খেরেস্তান’ করে তুলবে” (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৫৯)। সুতরাং পাড়ার মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণের তাগিদে মসজিদের মোল্লা সেদিন প্যাঁকালেদের বাড়িতে মৌলুদ ও ওয়াজের আসর বসানোর বন্দোবস্ত করে এবং পরদিন পির গজনফরকে আনিয়ে বক্তৃতাদানের আয়োজনের ব্যয়ভার প্যাঁকালের মা ও পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের নিকট হতে সংগ্রহের হুকুম দেয়। সমাজে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় প্যাঁকালের মাকে নির্বিবাদে এ দাবি মেটাতে হয়। এ জোর-জবরদস্তির প্রতিবাদ করার দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারে না। ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক সংঘাতময় অপরতাবোধের ভিন্ন নজিরও নজরুল দেখিয়েছেন এ উপন্যাসে। মেজো-বৌয়ের খোকার মৃত্যুর পর সে ‘চালশে’র আয়োজনে পাড়ার ছেলেদের একবেলা খাওয়ানোর আয়োজন করতে চাইলে বড়-বৌ তাকে জানায়, ‘মোড়ল না বললে, কেউ যে তার ছেলেকে তোর হাতের রান্না খেতে দেবে না’ (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৯০)। তাই মেজো-বৌ এর উপায় হিসেবে নিজের ‘খ্রিস্টাননি’ পরিচয় অকপটে ঘোচাতে মোড়লের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। মোড়ল সুযোগ পেয়ে তাকে মুসলমান হতে উদ্বুদ্ধ করে। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণনগরে শ্বশুরবাড়িতে ছেলেমেয়েকে রেখে বরিশালে এক বছর বাসকালে এক পর্যায়ে খোকা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সন্তানহারা জননীর প্রবল শোক ও অপরাধবোধে তাড়িত হয়ে সে পুনরায় মুসলমান হতে চাইলে মোড়লও সেই সুযোগ গ্রহণ করে– ‘তোর খোকা মরবার সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, ‘মা, তুই খেরেস্তান, তোর হাতের পানি খাব না।’ তুই মুসলমান হয়ে ওর ফাতেহা না দিলে ওর শাস্তি হবে’ (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৯০)। মোড়লের সংলাপের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ইঙ্গিত উপন্যাসে নেই। তবে এতে খ্রিস্টধর্মের প্রতি ঘৃণাজনিত অপরতাবোধ যেমন প্রকাশিত, তেমনিভাবে ইসলামী অনুশাসন মান্য করার জন্য মেজো-বৌয়ের প্রতি নির্দেশনাও রয়েছে।

১.৪.২. নারীকেন্দ্রিক অপরতাবোধ

বাঙালি সমাজে নারীর নিজস্ব অবস্থান, মর্যাদা অর্জন ও মেধা-পরিশ্রমগত মূল্যায়ন কখনোই তার স্বকীয় ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক নয়, বরং সর্বদাই পুরুষসাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। তদুপরি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যে পুরুষের অপর হিসেবে বরাবর অবনমিত, রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত সেই মানদণ্ডও বহুকাল যাবত অপরিবর্তিতভাবে অনুসৃত। পরিবার-সংসারকেন্দ্রিক বলয়ে বা বৃহত্তর সমাজে তার মেধা, বুদ্ধি, শক্তি, সম্ভাবনা বিকাশের যথার্থ কদর প্রায়শই অস্বীকৃত হয়। কন্যা-বধূ-জননীর নির্দিষ্ট ছক পেরিয়ে তার ব্যক্তিত্ব কখনোই মানুষ পরিচয়ে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে মূল্যায়িত হয় না। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক চক্রান্তের জেরে নারী নিজেই অন্য নারীকে অপর হিসেবে বিবেচনাপূর্বক স্বীয় আধিপত্য, দাপট দেখাতে ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তির শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হয়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে বিভিন্ন স্বকীয় পরিস্থিতিতে প্রান্তিক নারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসে নজরুল সচেতনভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন: 'ওমান কাত্‌লি' পাড়ার নারীরা কলতলায় জল আনতে গিয়ে যেভাবে জাত খোয়ানোর বিষয়ে কলহ সৃষ্টি করে, এর সঙ্গে আকস্মিকভাবেই যুক্ত হয় তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হিড়িম্বা কলহের একপর্যায়ে জাত খোয়ানোর অভিযোগ তুলে প্যাঁকালের মাকে অশ্লীল গালিগালাজপূর্বক আক্রমণ চালিয়েছিল– 'হ্যা লা ভাতার পুতখাগি! তিন বেটাখাগি! তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সেই ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৫)। পূর্বোল্লিখিত অভিযোগের সমান্তরালে সে প্যাঁকালের মাকে অন্য যে প্রসঙ্গে দায়ী করে, তা হলো, মা হিসেবে প্যাঁকালের মার জন্যই নাকি তার তিন ছেলে সোভান, বারিক ও গজালের মৃত্যু হয়েছে। নারীর প্রতি নারীর এ ধরনের অপরতাবোধ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখে পুরুষতান্ত্রিক মনোভঙ্গি। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে ও জন্মদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। তাই তার মৃত্যুর জন্য মাকেই দায়ী করা হয় এবং এক্ষেত্রে সেই নারীর স্বভাব বা আচরণ বা চারিত্রিক প্রবণতাকেই হাতিয়ার করা হয়। উপন্যাসের বিবরণে জানা যায়, 'পাহাড়ের মতো জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৮)।

নারীকেন্দ্রিক অপরতাবোধের আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসে, যেখানে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের বিধবা কর্ত্রী বৃদ্ধা প্যাঁকালের মা তার তিন বিধবা পুত্রবধূকে অভিশাপে বিদ্ধ করেছে, সন্তানদের জন্মদানের দায়ে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারটির সদস্যসংখ্যা সর্বসাকুল্যে উনিশ জন। তাদের নিত্যদিনের অন্নপূর্তি ও দিনযাপনের ব্যয়ভার বহনের সঙ্গতি তার নেই। ফলে অনাহারী শিশুদের কান্নাকাটি, পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন রোগে ভুগে শয্যাশায়ী হবার কাতরতা, দারিদ্র্যের পীড়ন মিলেমিশে তাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে। বদমেজাজী প্যাঁকালের মার পক্ষে ধৈর্য ধরে এ পরিস্থিতি নিত্যদিন সামলানো কঠিন হয়–

মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ি তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'মর্ মর্ মর্ তোরা! এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।' তারপর বৌদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'নে লা বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগিরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তেতবিরক্ত হয়ে গেল!' বলেই সে উচ্চৈঃস্বরে তার মৃত পুত্রদের নাম করে কাঁদে (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১৪)।

তিন ছেলের মৃত্যুর দায়ে প্যাঁকালের মাকে হিড়িম্বা যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, শাশুড়ি হিসেবে সেই বৃদ্ধাও প্রায় অনুরূপ অভিযোগে তিন পুত্রবধূকে অভিযুক্ত করে। 'বেটাখাগী' বলতে এখানে সে তার ছেলেদের তথা পুত্রবধূদের স্বামীদের বুঝিয়েছে। দারিদ্র্যের ভয়াবহতা কতটা ভয়াবহ হলে স্বয়ং দাদী তার নাতি-নাতনিদের জন্মদানকেন্দ্রিক গালাগাল ও কুৎসা বর্ষণ করে পুত্রবধূদের কদর্য সম্বোধনের মাধ্যমে, তা নজরুল অকপটে জানিয়েছেন। আর্থিক সংকট থেকেই যে প্রান্তবাসীর জীবনধারা ক্রমশ বিপন্নতার মুখোমুখি হয়, এ উপন্যাসের বিবরণে সেই নির্মম বাস্তবতা বিভিন্নভাবে উন্মোচিত হয়। ভারতের ঐতিহ্যবাহী একান্নবর্তী পরিবারকাঠামোর ভাঙনকে ঔপন্যাসিক সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইঙ্গিতে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আবহে বিন্যস্ত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত যে পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধ জনপদ বরিশালের গ্রামেও হানা দিয়েছে, উপন্যাসের শেষাংশে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নজরুল সেদিকে আলোকপাত করেছেন। মিশনারি কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বাঙালি নারীরা স্বাবলম্বিতার তাগিদে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণপূর্বক এর সঙ্গে যুক্ত হয়। মেজো-বৌয়ের সঙ্গে আরো তিনটি মেয়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ ভঙ্গিতে কালোপেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় বাঁকা সিঁথি কাটা, পায়ে 'হিল-শু' চড়ানো– প্রভৃতি পোশাক-বিধি তাদেরকে মানতে হয়। মিনতি নামের তালাকপ্রাপ্ত এক হিন্দু গৃহবধূ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সংসার ছেড়ে এখানে আসে। সে চোখের জল বদল করা মেজো-বৌয়ের একমাত্র সই, যাকে আপন ভেবে সে মনের একান্ত কথা বলতে পারে। মিনতি ও মেজো-বৌয়ের সঙ্গে আরো দুটি মেয়ে এ কাজে যুক্ত ছিল। মেজো-বৌ পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাক সাজগোজ গ্রহণে অনাগ্রহী। সে বিধবা নারীর থান পরে চলতেই অভ্যস্ত। মিশনারির কর্মী হিসেবে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি যিশুর মহিমা লোকসমাজে জানানোর ব্যাপারে বিমুখ। নিতান্তই বাধ্য হয়ে সে মিশনারির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এক বছর যাবত মিশনারিতে অবস্থানরত মেজো-বৌ পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মিশনারিতে যুক্ত হবার কারণ সম্পর্কে তার অবস্থান সুস্পষ্ট, যদিও অন্য নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এর ঠিক বিপরীত। তাই সে অকপটে তাদের বলে– 'মেম-সায়েব হতে আসিনি ... আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে ... এখন যা শিখেছি, তাতে করে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধে

হবে না’ (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৯৩)। বরিশালে মিশনারির হয়ে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের কাজে নিযুক্ত নারী সহকর্মীদের একজনের সঙ্গে মেজো-বৌয়ের আলাপচারিতায় গৃহবধূ বনাম পেশাদার নারীর মধ্যে বিদ্যমান অপরতাবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। মিনতি ‘মেজো-বৌ’ সম্বোধনে প্রতিধ্বনিত বাঙালির পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ অনুরণনকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এর প্রত্যুত্তরে সেই নারী তাকে ও মেজো-বৌকে ইঙ্গিতপূর্বক ব্যঙ্গ করেছিল। এর জবাবে মেজো-বৌ জানিয়েছিল, সে কখনোই পরিবারছিন্ন হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হতে চায়নি। এমনকি মিশনারি থেকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পোশাক ও জুতা পরে, আলাদা সাজে মেমসাহেব হয়ে ওঠার গরজও তার ছিল না। বাঙালি বিধবা নারীর আটপৌরে সাজেই সে স্বচ্ছন্দ। মিশনারিতে সে যুক্ত হয়েছিল পড়ালেখা শিখে স্বাবলম্বী হতে। তাই কৃষ্ণনগর ছেড়ে এসে এক বছর যাবত সে এখানে যা শিখেছে, তাতে যেখানেই যাক, সে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারবে। বাঙালি গৃহবধূ মেজো-বৌ ও মিনতির সমান্তরালে খ্রিস্টান মেমসাহেব মিস জোন্স ও তার অনুসারী মিশনারির অন্য দুজন বাঙালি নারীর আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে এ অপরতাবোধ বাঙালি বনাম ইংরেজ জাতিগত সাংস্কৃতিক ব্যবধানের সূচক।[১৪] বাঙালি নারী যতই খ্রিস্টান মেমসাহেব হয়ে ওঠার চেষ্টা করুক এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে মিশনারি প্রদত্ত ইংরেজি সাজ গ্রহণ করুক, তার উত্তরণ যে কখনোই মেমসাহেবের পর্যায়ভুক্ত হবে না, নজরুল সেদিকেও ইঙ্গিত দিতে উক্ত ঘটনাধারাকে বিন্যস্ত করেছেন।

১.৪.৩. মধ্যবিত্ত বনাম প্রান্তিক অপরতাবোধ

এ উপন্যাসে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বনাম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্বসূচক অপরতাবোধের দৃষ্টান্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিবৃত হয়েছে। বিশেষত, তাদের ভাষিক ব্যবধানটিই এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেহেতু চাঁদ-সড়ক এলাকার ‘ওমান কাত্‌লি’ পাড়ায় বিভিন্ন কায়িক শ্রমজীবী পরিবারের বসবাস, আর তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনে ব্যবহৃত আলাপের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও নিম্ন রুচিজাত, অপভাষা ও গালাগালমিশ্রিত, তাই ভদ্রলোকরা এর প্রতি বিরূপ। প্রতিপক্ষকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা পটু। এর সাক্ষ্য রয়েছে মিশনারির এক সহকর্মীকে উদ্দেশ করে বলা মেজো-বৌয়ের সংলাপে– ‘আমরা কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না। মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়ে’ (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৮৩)। সরকারি চাকরিজীবী নাজির সাহেব অন্য স্থান থেকে পরিবারসহ এ পাড়ায় আসে। তার স্ত্রী লতিফা পাড়ার নিম্নবিত্তের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় অনাগ্রহী। এর বিশেষ কারণ, তাদের কথাবার্তা, চালচলন ভদ্রলোকের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই তার বান্ধবী, নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হামিদ সাহেবের মেয়ে রুবি তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে আলাপপ্রসঙ্গে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ইংরেজ সরকারের বড় পদে চাকরিরত সাহেবের মেয়ে রুবি মোটরগাড়িতে চেপে আসে, পাড়ার লোকজন তার দিকে সমীহের দৃষ্টিতে তাকায়। বিয়য়টি তার জন্য অস্বস্তিকর হলেও সে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে

অসম্মত। এ ঘটনায় দরিদ্রদের প্রতি তার সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও লতিফার অবস্থান এর বিপরীত–

> রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'তাহলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস এতদিনে?' ... লতিফা হেসে বলল, 'হাঁ, তা আমি কেন, আমার ছেলেমেয়েরাও শিখে ফেলেছে। এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩৭৬)।

ভাষাগত অপরতার সঙ্গে যুক্ত রুচিগত ও সামাজিক অবস্থান আচরণগত স্বাতন্ত্র্য এবং ভিন্ন অর্থকাঠামোনির্ভর জীবনধারা একই পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠে। এর সম্পূরক আরেকটি দৃষ্টান্ত উপন্যাসে বিধৃত, যেখানে অপরতাবোধের পৃথক রূপ প্রকাশিত। দারোগা মির্জা সাহেবও একই পাড়ায় প্যাঁকালেদের বাড়ির অদূরেই পরিবারসমেত থাকে। তার স্ত্রী প্যাঁকালের পরিবারের প্রতি সমব্যথী। সেকারণেই 'তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে-টুকু ফেলে দিয়েছিল, তাই দারোগা-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তাঁর অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ-পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি'র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১৬)। এ প্রসঙ্গে নজরুলের বক্তব্য– 'এই না-চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ঐ আধ-সের জলের অনেক বেশি' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১৬)। প্রান্তিক মানুষের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতাবশত দারোগা গিন্নির এ অযাচিত সাহায্য করার অন্তরালে উন্মোচিত হয়েছে তাদের প্রতি উচ্চবর্গের তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মনোভঙ্গির স্বরূপ। বিড়ালের মুখ দেয়া দুধ ফেলে না দিয়ে পানি মিশিয়ে সে প্যাঁকালেদের বাড়িতে পাঠায় ঝিয়ের মারফত। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, একই পাড়ার বাসিন্দা হলেও মানবিকতা তার স্বভাবে প্রবল নয়, বরং লোকদেখানো ভালোমানুষীর আড়ালে থাকা কপটতা ও প্রতারক মনোভঙ্গিই তার স্বভাবে বিদ্যমান সমাজে নিজের সুনাম ছড়ানোর পায়তারাও এর অন্তরালে সক্রিয়। একই ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুসারীদের মধ্যেও আর্থ-সামাজিক ব্যবধানগত অপরতাবোধ যে বিদ্যমান, তা এ দৃষ্টান্তে প্রকাশিত।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী মানসিকতা ও অর্থলোভী দৃষ্টিভঙ্গি কতটা তীব্র হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবাপ্রদানের ছলে তাদের শোষণ করা যায়, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে উপন্যাসটিতে। সেজো-বৌয়ের অসুস্থতার প্রতিকারার্থে প্যাঁকালে 'ছিটেন' পাড়ার নকড়ি ডাক্তারকে ডেকে আনতে চাইলে তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের বিনিময়ে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। নকড়ি ডাক্তার যদিও বলে– 'গরিব লোক তোরা, বিজিট আমি নেব না বাপু' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১৯), তবু রোগীকে দেখতে আসার পূর্বেই সে প্যাঁকালেকে

তিন দিন খাটিয়ে 'বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দেবার চুক্তি' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩১৯) করে। সে হার্টফেল করার অবস্থাপন্ন রোগীকে কোনো ঔষুধ না দিয়ে শুধু মুরগির বাচ্চার ঝোল খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। তার চিকিৎসায় মেজো-বৌ ভরসা করতে পারেনি। সেকারণেই সে নকড়ি ডাক্তারকে 'ছাই-পাশ নৈবেদ্যি' সম্বোধনপূর্বক ব্যঙ্গ করে। ডাক্তার হিসেবে রোগীর প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে সে রূপবতী মেজো-বৌয়ের দিকে কামুক দৃষ্টিতে বারবার তাকায়। এরপর প্যাঁকালের নিকট হতে দুই হালি মুরগির ডিম বিনামূল্যে আদায় করে 'একটু ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার' (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩২০) এ অজুহাতে। সেজো-বৌয়ের রোগের প্রতিবিধানে তার আগ্রহ ছিল না। বরং প্যাঁকালেকে দিয়ে কীভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করা যায়, সেটিই ছিল তার উদ্দেশ্য। এর অন্তরালেও প্রান্তিক মানুষের প্রতি তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণির প্রবঞ্চনাগত অপরতাবোধ সক্রিয়।

১.৫. প্রান্তজনের গোত্রান্তর ও উত্তরণপ্রয়াস

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিশেষ দিক হলো নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণায় রুচিশীলতা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বোধ ও মানবসভ্যতার প্রতিনিধিত্বের গুণগান করা। ইউরোপ বা পাশ্চাত্য যেভাবে চলবে, যা অনুসরণ করবে, সেটিই অবশিষ্ট বিশ্বের জন্য কল্যাণকর ও মাননীয়, এরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার বিবিধ অভিসন্ধি ভারতের জনগণের ওপরও কার্যকর থেকেছে। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে লর্ড মেকলের প্রবর্তিত শিক্ষানীতির আলোকে শহুরে শিক্ষিত কেরানি সম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। চেহারায় ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় পাশ্চাত্য-অনুসারীদের নিয়ে উনিশ শতকে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল শহুরে বাবু-ভদ্রলোক শ্রেণি। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুসরণে বাংলার এই নবজাগরণের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য নিয়ে একালেও সমাজবিজ্ঞানী-ইতিহাসবিদ-বুদ্ধিজীবী-চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।[১৫] নজরুল উপন্যাসটিতে আংশিকভাবে এর রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের মধ্যেও যে ক্ষেত্রবিশেষে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুসারী কলকাতার বাবু সমাজের রুচিবোধ-পোশাক-পরিচ্ছদ ও অভ্যাস-আচরণগত অনুকরপ্রীতি লক্ষণীয়, প্যাঁকালে চরিত্রে এর প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের বাসিন্দা প্রান্তিক বাঙালির পরনে সারাবছর লুঙ্গি ও ফতুয়াই সম্বল, শীতকালে বড়জোর চাদর বা উড়ানি। পোশাক বা সাজসজ্জার দিকে খেয়ালের পরিবর্তে পেটের ভাত যোগাতেই তাকে উদয়াস্ত খাটতে হয়, পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। প্যাঁকালে তার অন্তর্গত গুণাবলি বিকাশে সচেষ্ট বিধায় রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি টাউনের বাবুদের থিয়েটারের দলে নাচে, গায়, সখী সেজে অভিনয় করে। "বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেড়ি কাটে (চুল সিঁথি করে), 'ছিকরেট' টানে, গান গায়, চা পান করে। পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে– 'যেমন গলা, তেমনি গান, তেমনি সৌখিন!' 'থিয়েটরে' লাচে–বাবুদের ঠিয়েটরে, ঐ খেরেস্তান পাড়ার যাত্রার গানে লয়। হুঁ হুঁ' " (রফিকুল ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩০৭)। পাড়ার অন্য যুবকদের চেয়ে সে যে আলাদা, এই আত্মসচেতনতার অন্তরালে

তার স্বকীয়তা যেমন প্রতিফলিত, তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় অন্তর্গত অপরতাবোধও প্রকাশিত। কারণ সে নিজেকে বাবুদের দলভুক্ত হিসেবে বিবেচনায় আগ্রহী। সেকারণেই পাড়ার নারীমহলে তাকে নিয়ে গোপন প্রতিযোগিতা চলে, সম্ভাব্য মেয়েজামাই করার অভিলাষে। গান গাইতে গাইতে 'ছিকরেট' টেনে রাজমিস্ত্রির কাজে যাবার সময় পাড়ার বৌ-ঝিরা যে তাকে খেয়াল করে, এ ব্যাপারটিও সে লক্ষ করেছিল। ফলে, নিজের প্রতি তার একধরনের উচ্চম্মন্যতাজাত অহংবোধ গড়ে ওঠে। সিগারেট টানার পাশাপাশি চা পানের অভ্যাস, তেল-চিটে চুল সযত্নে টেড়ি কাটা ও এজন্য আয়নার বন্দোবস্ত করা, এমনকি সাহেবের অনুসরণে কোট পরিধান– প্রভৃতিও তার স্বকীয় স্বভাবের পরিচায়ক। সে পারতপক্ষে বিড়ি টানে না। কারণ সে জানে, রাজমিস্ত্রি হিসেবে তার দলের সঙ্গীরা বিড়ি টানে, একটি বিড়িই ভাগাভাগি করে খায়, এমনকি দেশলাইয়ের বাড়তি কাঠি খরচ করার সংগতিও তাদের নেই। তাদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় এদিক থেকেও প্যাঁকালে উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। কৃষ্ণনগর ছেড়ে রানাঘাটে গিয়ে দিনপ্রতি তার উপার্জন চার আনা থেকে বেড়ে চৌদ্দ আনা হয়। বছরখানেকের ব্যবধানে বরিশালে মিশনারির চাকরিতে পিয়ন হিসেবে সে প্রথমে পনেরো টাকা মাসিক হিসেবে ও এরপর কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেবের মারফত বিশ টাকা বেতনের চাকরি পায়। ফলে, আর্থিক বন্দোবস্ত যে তার রাজমিস্ত্রিসুলভ কায়িক শ্রমজীবীর প্রান্তিক অবস্থানকে উচ্চকিত করে চাকরিজীবী হিসেবে গোত্রান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে, এতেও তার সামাজিক অবস্থানগত উত্তরণ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তার পেশাগত যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা ভূমিকা রাখলেও অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা, বাবু সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও তা অনুসরণ– প্রভৃতির প্রভাবও সক্রিয়। আরেকটি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। প্যাঁকালের সামাজিক উত্তরণ নিতান্তই ব্যক্তিগত, বৃহত্তর জনসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত হরহামেশা লক্ষণীয় নয়। তার বৈষয়িক উন্নতি ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে পরিস্থিতিগত সুযোগকে কাজে লাগানো এবং কুর্শির সঙ্গে বিয়ে ও পারস্পরিক বোঝাপড়াগত দিকটিও সম্পৃক্ত, যা প্রান্তবাসীর ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে না। উপন্যাসের ঘটনাসমূহের আলোকে এ অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচিত হতে পারে। নজরুল সংক্ষিপ্ত পরিসরে অত্যন্ত সংহতরূপে চরিত্রটির গড়ন ও বিকাশে এ বিষয়টিকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রান্তবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন যে অসম্ভব নয়, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটিয়ে ধৈর্য ধরে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হলে সেটি যে একপর্যায়ে বাস্তবায়িত হতে পারে, প্যাঁকালে চরিত্রের রূপায়ণে নজরুল সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ উপনিবেশে রূপান্তরিত ভারতের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের পটভূমিতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরিসরে ঔপনিবেশিক অভিঘাতের চালচিত্র রূপায়ণে অভিনিবিষ্ট থেকেছেন। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ভারতীয় জনজীবনে বিবিধ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রপরিচালনার সমান্তরালে মিশনারি কর্তৃক খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু প্রান্তজনের ধর্মান্তরিত হবার বৃত্তান্তকে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপায়ণ উপন্যাসটির তাৎপর্যমণ্ডিত দিক।

নজরুলের রাজনৈতিক বীক্ষা এ উপন্যাসে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যেখানে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যাশায় প্রান্তজনের সঙ্ঘবদ্ধতা স্ফুরিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত কৃষ্ণনগরের বাসিন্দাদের মধ্যে বিদ্যমান অপরতাবোধের চালচিত্রও উপন্যাসটিতে গ্রন্থিত। নজরুলের যুগমানসে সঞ্চিত অভিজ্ঞান, সংবেদনশীল-সচেতন পর্যবেক্ষণ ও রাজনৈতিক বীক্ষার মিথস্ক্রিয়াজারিত শিল্পচেতনার স্ফুরণ উপন্যাসটিকে সমকালীনতার আবহকে কালজয়ী মর্যাদায় সম্প্রসারিত করেছে।

অন্ত্য-টীকা

১. নজরুলের সুহৃদ কমরেড মুজফফর আহমদ জানিয়েছেন–

নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে সেই বাড়ীতে উঠে গেল। বাড়ীটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন খ্রীস্টান মহিলা। ... এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক ইলাকা। শ্রমজীবী খ্রীস্টান ও মুসলিমদের বাস এই ইলাকায়। নজরুলের উপন্যাস "মৃত্যুক্ষুধা" এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল (মুজফ্‌ফর, ২০১২ , পৃ. ২০৩)।

২. *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা ও মতাদর্শের প্রতিফলন থাকলেও এটিকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হিসেবে অভিহিত করতে আমরা অনাগ্রহী। এক্ষেত্রে কিছু যুক্তি হল– ক. উপন্যাসটির আদ্যন্ত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও ভাববস্তুর ক্রমবিস্তার ঘটেনি, যা ঘটনাপ্রবাহভিত্তিক আখ্যানভাগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ। খ. নজরুলের রাজনৈতিক বীক্ষা ও অবস্থান উপন্যাসটির কুশীলবদের মাধ্যমে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হলেও আত্মজৈবনিক কিছু উপাদান ব্যতীত অবশিষ্ট বিশালাংশই তাঁর ঔপন্যাসিক ভাবনাপ্রসূত বিশুদ্ধ কল্প-অনুভব ও ভাবাবেগময় কথামালা। সেখানে সমকালীন রাজনীতির উল্লেযোগ্য প্রসঙ্গ ও প্রভাব তেমন জোরালো নয়। গ. আনসার, মেজো-বৌ, রুবিকেন্দ্রিক ত্রিভুজ প্রেমের বৃত্তান্ত উপস্থাপনের পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক ও ভদ্রসমাজের চালচিত্র গ্রন্থনায় সামাজিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চালচিত্র যতটা উপস্থাপিত, রাজনৈতিক বিষয়াদি এর সমান্তরালে ততটা গুরুত্ব পায়নি। ঘ. কিছু রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ ও তথ্যসহযোগে নজরুল যে উপন্যাসটি লিখলেন, এতে রাজনীতি জোরালোভাবে পাঠকের মনোনিবেশ পায় না। বরং পূর্বোল্লিখিত ত্রয়ী চরিত্রকেন্দ্রিক বয়ানের মানবিক আবেদন ও আবেগোচ্ছাসের ব্যঞ্জনাশ্রিত কথামালা হিসেবে এটি স্বকীয় বোধে তাকে উদীপ্ত করে। ঙ. ঔপনিবেশিক কালপর্বের সামাজিক ইতিহাসের ছায়াপাত আংশিকভাবে এতে উপস্থিত থাকলেও সেটির সঙ্গে তদানীন্তন রাজনীতির আংশিক সংযোগসাধনের পরিণতিতে উপন্যাসটি সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করেনি।

সমালোচক রাজনৈতিক উপন্যাস প্রসঙ্গে অভিমত জানাতে গিয়ে বাংলা উপন্যাসের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে বলেছেন–

প্রচলিতভাবে যেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল; কোন রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন-প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিতঃ কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গতঃ কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে। ... বাংলা "রাজনৈতিক উপন্যাস" ... (মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর পঙ্গুতা-সার্থকতা-সীমাভাঙ্গা-স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসেরই বৃত্তে। ... যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই এই শ্রেণী ধারাবাহিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোন সময়ই সেভাবে করেনি, সেহেতু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, আন্দোলন নিয়ে যে সব উপন্যাস লেখা হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত হয় পারিবারিক, নয় ত্রিমুখী ব্যক্তির, সংঘাত অথবা ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নের দিকে গেছে। অন্তত ... ১৮৬৫-১৯৪০ পর্যন্ত একথা সত্য, ব্যতিক্রম বোধহয় 'আনন্দমঠ' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১, পৃপৃ. ১১–১২)।

৩. ইতিহাসবিদের অভিমত–

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র (ভারত) একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনে প্রথমে দৃশ্যমান পদক্ষেপ ছিল কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ (১৭৬৫)। ... ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ... কোম্পানি কর্তৃক এ দেশে একটি রাজ্য স্থাপন এর লক্ষ্য ছিল না। সক্রিয়ভাবে এহেন রাজ্য স্থাপনের চিন্তা প্রথম করেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ... ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় কর্নওয়ালিস প্রশাসন (১৭৮৬-৯৩) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হবে এবং কিভাবে তা শাসিত হবে এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করে কর্নওয়ালিস সরকার। ... ১৭৮৬ সাল থেকে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে তাঁর বিখ্যাত ভূমিনীতি ঘোষণা করেন। ... চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এসে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোগত পূর্ণতা লাভ করলো। ... ১৭৯৩ সাল থেকে কোম্পানিই ... ছিল এ দেশের সর্বময় কর্তা (সিরাজুল, ১৯৯৩, পৃপৃ. ১০–১১)।

৪. সমালোচক জানিয়েছেন–

'মৃত্যু-ক্ষুধা' [প্রথম প্রকাশ–ফাল্গুন ১৩৩৬ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ] উপন্যাসের জন্য নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবেই কতকটা দাবি করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থকশিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন। 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র পটভূমিকা কৃষ্ণনগরে। নজরুল এক সময় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকায় বাস করতেন। শ্রমজীবী খ্রীষ্টান

মুসলিমেরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিল। 'মৃত্যু-ক্ষুধা' এই পরিবেশে লেখা। উপন্যাসের সময় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ (সুশীলকুমার, ২০০৭, পৃ. ২৭১)।

৫. সমালোচকের অভিমত–

ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে একটি তত্ত্বগত আদর্শ, একটি পারস্পরিক সম্পর্ক, যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও পরাধীনতার ওপর ভিত্তি করে। আর এ সম্পর্কের প্রথম অংশের অধিকারী পাশ্চাত্য আর শেষাংশের ভারবাহী পূর্ব; অর্থাৎ প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের বা শাসিতের ওপর শাসকের শ্রেষ্ঠত্ব; স্বাভাবিকভাবেই একজন যদি প্রভু হয়, তবে অন্যজন দাস। ... দীর্ঘ প্রচলিত কলোনি ও কলোনাইজারদের এই একরৈখিক সম্পর্কের আবরণে অবিচ্ছিন্নভাবে সংগোপনে সক্রিয় ছিল সাম্রাজ্যবাদের একাধিক অভিসন্ধি। ফলে ল্যাঙ্কশায়ারের সমুদ্রবন্দরগুলো থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল বাণিজ্যপণ্যই নয়, কলোনিগুলোতে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু; ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন, এমনকি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কলোনি ও তার অধিবাসীদের ওপর রাজনীতিক, প্রশাসনিক ও মানসিকভাবে আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর আদি বাসিন্দাদের মধ্যে একধরনের হীনতর মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা। দার্শনিক ও আর্থনীতিক দিক দিয়ে কলোনিগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের এই কাঠামোকেই ইম্পিরিয়ালিজম বলা হয়। ... প্রধানত দুই ধরনের কলোনি বা উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্রবাদ: বসতি উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক উপনিবেশ। আর ইম্পিরিয়ালিজম মূলত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের ... সঙ্গে কলোনিগুলোর নৈতিক দিক দিয়ে সংযুক্ত থাকার দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে। অন্যদিকে কলোনিয়ালিজম ঐ দার্শনিক তত্ত্বেও প্রায়োগিক বাস্তবতাভিত্তিক রীতি। এ কারণে ইম্পিরিয়ালিজম যদি সাম্রাজ্যের তত্ত্বদর্শন হয় তবে কলোনিয়ালিজম তার প্রায়োগিক বাস্তবতা (আমীনুর, ২০০৭, পৃপৃ. ১৫–১৭)।

৬. ব্রিটিশ উপনিবেশে রূপান্তরিত ভারতের পরাধীনতা ও এর বাসিন্দাদের অবরুদ্ধ জীবনধারা, হীনম্মন্যতাবোধ, অন্যের অধীন হবার মর্মন্তুদ বেদনা নজরুলকে প্রতিবাদী ও বিক্ষুব্ধ করেছিল। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *রুদ্রমঙ্গল* প্রবন্ধগ্রন্থভুক্ত 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর এ দ্রোহী মনোভাব বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত, যা থেকে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, এর চার বছর পর প্রকাশিত *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে তিনি ব্রিটিশ শাসন ও ভারতের উপনিবেশী-শৃঙ্খল মোচনে অকুতোভয়। বামপন্থী ধারার আদর্শে প্রত্যয়ী আনসারের মাধ্যমে ভারতের গণমানুষের স্বাধীনতালাভের লড়াইকে ভিত্তি করে নজরুল এ ভাবনার রূপায়ণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন–

> ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে

> কোনো বিদেশীর মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোচকা-পুঁটলি বেধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। ... পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকলকিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে (রফিকুল, ২০০৭, পৃ. ৪২৮)।

৭. কার্ল মার্কসের অভিমত–

> প্রায় দেড়শ' বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেন তার ভারত সাম্রাজ্যের মেয়াদ বজায় রাখার অপচেষ্টা করেছে যে মহা সূত্রে সেটি হল রোমানদের divide et impera (বিভক্ত করে শাসন করো)। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্মবিশ্বাস ও সার্বভৌমদের যে যোগফল থেকে গড়ে উঠেছে ভারত নামের ভৌগোলিক ঐক্য তাদের পরপর বৈরিতাই বৃটিশ প্রাধান্যের মূল নীতি হয়ে এসেছে। ... ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবস্থার প্রভূত বদল হয়েছে। এখন আর ভারতের এক অংশের সহায়তায় অন্য অংশকে তা আক্রমণ করে না, সে নিজেই এখন সর্বপ্রধান, গোটা ভারত তার পদতলে। আর জয় করার কাজ নেই বলে এ এখন হয়ে উঠেছে দেশের একমাত্র বিজয়ী। (কার্ল ও ফ্রেডরিক, ১৯৭১, পৃপৃ. ১৩১–১৩২)।

৮. দুজন সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. ইমানুয়েল কান্টের মতে, জ্যোতির্ময়তা (এনলাইটেনমেন্ট)– এই শব্দটির অর্থ মানবজাতির নাবালকত্ব থেকে উত্তরণ। এই নাবালকত্ব মানুষ নিজেই নিজের উপরে আরোপ করেছিল। নাবালকত্বের অর্থ অন্যের নির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেচনা ব্যবহার করার অক্ষমতা। সংকল্প ও সাহসের অভাবে এই অপরিণত অবস্থান স্ব-আরোপিত হয়, বোঝার ক্ষমতার অভাবে নয়। 'জানার সাহস'। "নিজের বিবেচনা ব্যবহার করার সাহস অর্জন করো।"– এই কথাটিই জ্যোতির্ময়তার মূলমন্ত্র (ফজলুল, ২০০৮, পৃ. ১৭)।

খ. ইয়োরোপীয়রা সম্ভবত মনে করে যে ইয়োরোপিয়ান সংস্কৃতি ও সত্তাই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক সত্তা। ... ইউরোপীয় পণ্ডিতদের, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের ধারণা যে, সব সত্তাই, সব সংস্কৃতিই তাদের থেকে নিম্নস্তরের এবং হয়ত বা কোনো কোনো সত্তা অথবা সংস্কৃতি একেবারেই আদিম মানুষের সত্তা বা সংস্কৃতির সমতুল্য, যা পরিষ্কার স্লেটের মতো, যেখানে নতুন করে লেখা সম্ভবপর। ... তাদের একটা দায় আছে মনুষ্যত্বের প্রতি। ... কান্টের এই বচন ও তার ব্যাখ্যা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে যুক্তি খাড়া করলেন যে, যদি কোনো মানুষের বা মানবগোষ্ঠীর স্বভাবে

এইবোধ না থাকে বা কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠী যদি আদিম ও পরিষ্কার স্লেটের মতো প্রাথমিক সত্তাবিশিষ্ট হয় তবে তাদের তো সংস্কৃতিবান করে তুলতেই হবে। অথবা যারা নিম্নতর সংস্কৃতির, তাদেরকেও উচ্চমার্গের সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে। এদের সংস্কৃতিবান করে তোলার (তাদের মতে সমগ্র পৃথিবীটাকেই– ইউরোপ, আমেরিকাবাদে) দায় তো তাহলে ইউরো-আমেরিকার সংস্কৃতিকেই নিতে হবে। আর যদি এসব মানুষের সত্তা ... কোনো কিছুকে ধারণ করার বা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিরোধসম্পন্ন হয়– তাহলে তো জোর জবরদস্তি করতেই হবে (আনন্দ ঘোষ, ২০০৮, পৃপৃ. ৬৪–৬৫)।

৯. অপরতাবোধের ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় শাসকগোষ্ঠী দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সমাবেশে সামরিক শক্তি প্রয়োগপূর্বক অন্য দেশ দখল ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বৈধ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক ও সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. হেগেলের দর্শনে অপর হল আত্ম (self)-এর বিরোধী। প্রথমে আত্মর নেতিকরণ হিসেবে এল অপর (other)। হেগেল দুই চৈতন্যের মুখোমুখি এই সংঘাতকে বর্ণনা করেছেন তাঁর *ফেনোমেনলজি অফ স্পিরিট* গ্রন্থের মাস্টার অ্যান্ড স্লেভ অধ্যায়ে। হেগেল দেখান ... আত্ম পরিচয় উদ্ভূত হতে পারে কেবল অন্যদের সাথে মুখোমুখি সংঘাতের মধ্য দিয়ে। সুতরাং অপরের উপস্থিতি না থাকলে আত্মর ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। ... হেগেলের অপর ধারণায় মানুষ সবকিছুকেই আপন অধিকারে নিজের দখলে আনতে চায়। ... এই আকাঙ্ক্ষা অপরকে আত্মসাৎ করে। ... মানুষ ক্রমশ হাত বাড়াল চারপাশের অন্যান্য মানুষের দিকে আত্মসমর্পণ তাকে করতেই হয়। কারণ বেঁচে থাকাটা তো শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে জরুরি (অরবিন্দ, গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃপৃ. ১৫৭–১৫৮)।

খ. The colonized subject is characterized as 'other' through discourses such as primitivism and cannibalism, as a means of establishing the binary separation of the colonizer and the colonized ... the term is extensively in existential philosophy, notably by Sartre in *Being and Nothingness* to define the relations between Self and Other in creating self awareness and ideas of identity ... current post-colonial theory is rooted ... in the work of the psychoanalyst and cultural theorist Jacques Lacan. Lacan's use of the term involves a distinction between the 'Other' and the 'other' ... in Lacan's theory the other – with the small 'o' ... refer to the colonized others who are marginalized by imperial discourse. Identified by their difference from

the centre and, perhaps crucially, become the focus of anticipated mastery by the imperial 'ego'. (Bill and others, 2004: page. 169-170)

গ. বাংলা ব্যাকরণে 'অপর' শব্দ সর্বনাম ও বিশেষণ স্বরূপ। উত্তর ঔপনিবেশিক সংজ্ঞার্থের ইংরেজি অভিধানে শব্দটির ঔপনিবেশিক বা কলোনিয়াল প্রেক্ষিত থেকে ... অপর শব্দের ব্যুৎপত্তিতে রয়েছে দূরত্ববোধকতা। ভিন্ন, অন্য, তারতম্য, দ্বিতীয়, পৃথক, ইত্যাদি। দ্বিপাক্ষিক বৈপরীত্যবোধ থেকে যে অর্থময়তায় যুক্ত হয়েছে 'পর' যা অপর শব্দের বিপরীতার্থ। যেমন 'অপর' প্রযুক্ত হয়েছে বিজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ব্রাত্য, পিছিয়ে পড়া, ইতর, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, বিরোধী, প্রতিকূল ইত্যাদি অর্থে। যে ভিন্ন কিন্তু তার শর্তে গ্রহণীয় সে উত্তম অপর, আর যে গ্রহণযোগ্য নয় সে অধম অপর। ঔপনিবেশিকতার আয়োজনে ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল, শাসিতকে নিকৃষ্ট ঠাউরে নিয়ে শাসনের ঔচিত্য দাঁড় করানো এবং বজায় রাখা (অরবিন্দ, গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃপৃ. ৫–৬)।

ঘ. সব অর্থেই কেন্দ্রর একমাত্র কাজ এবং উদ্দেশ্য হলো: সবকিছুর মধ্যেই একাধিপত্যের 'আমি' হয়ে ওঠা। সবযুগে, সবকালে, শাসকেরা নিজেদের সুবিধার্থে একটা 'আমি'-ও কেন্দ্রাভিগ সংস্কৃতি গড়ে নেয়। সেখানে পুলিশ তার 'আমি', মিলিটারি তার 'আমি', ... এই আমি'-র প্রতিটি অভিব্যক্তিই ক্রমাগত একটি সংঘর্ষক্ষেত্রের জন্ম দিয়ে চলেছে। ব্যক্তিরূপে শিলীভূত 'আমি'-র শ্রেণী রাজনীতির ছদ্মবেশটা বিভিন্ন উপনিবেশে প্রথম সংক্রমিত করে সাম্রাজ্যবাদ। কারণ সাম্রাজ্যবাদের 'আমি' সদাসর্বদা নিজের সামনে দেখতে চায় : সমর্পণ ও আনুগত্য। আর এই আনুগত্যের পথ ধরেই জমি থেকে তেলের খনি বেমালুম সব দখল হয়ে যায়। ... সবচেয়ে ওপরে থাকা প্রভুশক্তি সবক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যায় অঞ্চল স্থানিকে। ... অর্থাৎ ওপরে থাকা প্রভুশক্তি খণ্ড খণ্ড কার্যকারিতার সূত্রে বিভিন্নরকম স্থানিক প্রভুর রূপ ধরে একটা সময় সামনে এসে উপস্থিত হয়। নিম্নবর্গেও মানুষ ওপরের প্রভুশক্তিতে নয়, দেখতে পায় স্থানীয় ভাগ্যবিধাতাদের (জহর, ২০০৭, পৃপৃ. ১৯–২০)।

ঙ. 'পর'কে যদি 'আত্ম'র শাসনভুক্ত, শর্তসাপেক্ষ করে তোলা যায়, 'পর'কে যদি 'আত্ম'র মনোমত ছাঁচে সাজিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেই 'পরে'র স্বাতন্ত্র্য লোপ পেতে বাধ্য। ঐ আত্মীকৃত আদল বা নির্মিতি তাকে পরিণত করে 'আত্ম'র এক প্রক্ষেপে, প্রতিবিম্বে। 'পর' তখন আর ঠিক পর থাকে না, পৃথক কোনো সত্তায়, নিজস্ব কোনো সংজ্ঞায় তাকে শনাক্ত করা যায় না, পর হয়ে ওঠে 'আত্ম'র উৎক্রম (ইন্‌ভারশান্‌), সবয়ব প্রত্যক্ষতা হারিয়ে মনগড়া, বিমূর্ত ধারণা কেবল। আত্মকেন্দ্রিক এই চিহ্নব্যবস্থায় 'পর' কখনই বিষয়ীর মর্যাদা পায় না, নিছক বিষয় থেকে যায়। ... 'আত্ম' যেহেতু 'পরে'র মুকুরেই নিজেকে দেখতে চায় তাই নিজের কাছেও তার

পরিচয় মূলত নেতিবাচকই থেকে যায়–উৎক্রমের উৎক্রম ঘটিয়েই কেবল পৌঁছোনো যায় আত্ম-কেন্দ্রে, এমন এক কেন্দ্রে, আদতে যা ফাঁপা এবং ফাঁকা (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১, পৃপৃ. ৮–৯)।

১০. এডওয়ার্ড সাঈদ ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদের স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে কেন্দ্র-প্রান্ত যুগ্ম-বৈপরীত্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অভিমত ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য–

পশ্চিমে ক্ষমতার একটি কেন্দ্র এবং তা থেকে প্রাচ্যের দিকে বিচ্ছুরিত একটি বিরাট, সর্বগ্রাসী যন্ত্র কল্পনা করেন ক্রোমার। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে অক্ষুণ্ন থাকে, যন্ত্রটির নিয়ন্ত্রণও থাকে তার হাতে। প্রাচ্যে যন্ত্রটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যন্ত্রটিতে যা সরবরাহ করে তা হলো–মানববস্তু, বস্তুগত সম্পদ, জ্ঞান ... যন্ত্রটির দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে আরো অধিক ক্ষমতায়। ... প্রাচ্যজন পরিণত হয় শাসিত জাত-এ, প্রাচ্য মানসিকতার নমুনায়, এবং সবই ঘটে দেশে (ইংল্যান্ডে) কর্তৃত্ব বৃদ্ধির নিমিত্তে। 'স্থানীয় স্বার্থ' প্রাচ্যতাত্ত্বিকের বিশেষ স্বার্থ, সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের প্রধান স্বার্থ হলো 'কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব' (ফয়েজ, ২০০৭, পৃ. ৮২)।

১১. সার্বজনীনতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপরতাবোধের ভিত্তিতে। ইয়োরোপীয় জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যই হল শক্তির দাপটে আধিপত্য বিস্তারপূর্বক উপনিবেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনবাস্তবতা ও সেখানকার বাসিন্দাদের নিজস্ব পরিচয়কে অস্বীকার করা। তাদেরকে বশীভূত করতে ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও আদর্শবাদের বিপরীতে প্রাচ্য ভূ-ভাগের বাসিন্দাদের নিচতা, পশ্চাৎপদ অবস্থান ও স্থূল দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্নভাবে প্রমাণের পায়তারা এক্ষেত্রে কার্যকর থাকে। নিজেদের ভাষা, শিক্ষা, মূল্যবোধ, ধর্ম ও সংস্কৃতিই যে উপনিবেশিতদের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক, তা গ্রহণের মাধ্যমে তারা যে মানবসভ্যতার ধারাকে অগ্রসর করতে পারবে, এরূপ প্রবঞ্চনাজাত মনোভঙ্গি গড়ে তুলে তাদের চেতনালোককে দখল করতে উপনিবেশকরা সচেষ্ট থাকে। এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অভিমত–

The assumption of universalism is a fundamental feature of the construction of colonialism power because the 'universal' features of humanity are the characteristics of those who occupy positions of political dominance. It is these people who are 'human', who have a legitimate history, who live in the world … (দেবাশিষ, ২০১০, পৃ. ৬৭)।

১২. ঐতিহাসিক মুহাম্মদ মোহর আলী কৃষ্ণনগরে মিশনারী কর্তৃক ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

There had been mission station of the Church Missionary Society at Krisnanagar, in the district of Nadia, since 1831; but no apparent success

attended ther missionary efforts there till 1839. Early in that year there began a large-scale movement for conversion to Christanity. The people of 50 to 60 villages, numbering about 3,000 persons, offered themselves for Baptism, of whom 600 had already been admitted into the church within the course of a month. (Muhammad Mohar, 1965, page : 144).

১৩. সমালোচকের অভিমত–

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকেরা এসেছে এদেশে, উদ্দেশ্য উদ্ধার করবে মানুষকে, আসলে জয় করাই ছিল অভিপ্রায়, ভূমি জয় করেছে তাদের ভ্রাতারা, কোম্পানির লোকেরা, তারা জয় করবে আত্মা। কিন্তু এসে দেখেছে ধর্মান্তরিত করা মোটেই সহজ নয়, খুবই কঠিন। কেননা দেয়াল রয়েছে তোলা। ... হিন্দু সমাজে কঠিন কঠোর প্রাচীর আছে তোলা–বর্ণপ্রথার। ... শাস্ত্রজ্ঞান নেই যাদের তাদের ওপর শাস্ত্রের শাসন ঠিকই আছে। রয়েছে বর্ণপ্রথা। সেই প্রাচীর ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য। হ্যাঁ। লোকেরা আসে। যীশুর করুণা ও ক্ষমার বাণী মন দিয়ে শোনে। আবেগে আপ্লুত হয়। কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে ধর্মান্তরের তখন পিছিয়ে যায়। বলে সেটা সম্ভব নয়। জাত যাবে। নির্বাসন ঘটবে। লোকে চাল, দুধ, মাছ কিনবে না, বেচবেও না। বিবাহাদি বন্ধ। না, ও পথে যাওয়া যাবে না। সমাজপতিদের ধারণা বর্ণপ্রথা হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছে। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা ভাবতো সঙ্কীর্ণ করেছে। সে-তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে (সিরাজুল ইসলাম, ২০১১, পৃপৃ. ৭৪–৭৫)।

১৪. সুমিতা চক্রবর্তীর অভিমত–

১৯২০-২১ থেকে তিরিশের দশক জুড়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের নানাবিধ সক্রিয়তা কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে খুবই বেড়েছিল। অনেকগুলি মিশন, প্রাথমিক স্কুল, সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু দরিদ্র মানুষ সহায়তা পেত সে সত্যও অস্বীকার করবার নয়। ... নজরুল কিন্তু পাদ্রিদের প্রতি কটুক্তি বা বিরূপ ভাব প্রদর্শন করেননি। সত্যকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারই যে উদ্দেশ্য তাও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু জোর করে নয়। দরিদ্রকে সাহায্য করেই ধর্মান্তরিত করেন পাদ্রিরা। অবরুদ্ধ, অসহায় মানুষগুলিকে বাঁচার পথ দেখাবার চেষ্টা করেন। স্বজাতি, স্বধর্মের কাছে কোনো আশ্রয় বা সাহায্য তারা পায় না। এই স্বীকৃতি তাঁর উপন্যাস খ্রিস্টান মিশনারিদের দিয়েছে (সুমিতা, ২০০৭, পৃ. ১৪২)।

তাঁর এ বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত রয়েছে। এ উপন্যাসে নজরুল বিভিন্ন ঘটনার আলোকে এবং চরিত্রের পরিণাম ও মনোভঙ্গিগত রূপান্তরসাধনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, ক্রিস্টান মিশনারি ও এর জনবলের অংশ হিসেবে পাদরি ও মিস জোন্সের সহযোগিতাপ্রবণ আচরণ,

সংলাপ, ব্যবহারের অন্তরালে রয়েছে প্রান্তিক মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করানোর পরিকল্পনা। এর পরিণতিতে স্বীয় পরিবার, সমাজ থেকে নির্বাসিত করিয়ে অচেনা অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মেজো-বৌ, মিনতি ও অন্য নারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত উপন্যাসে বিধৃত। ফলে, সুমিতা চক্রবর্তীর কথিত বক্তব্যের অনেকাংশই আমাদের নিকট উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সমর্থনপুষ্ট বিবেচিত হয়নি।

১৫. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭।

সহায়কপঞ্জি

অরবিন্দ প্রধান (সম্পা.)। (গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)। *অপর : তত্ত্ব ও তথ্য*। হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলকাতা।

আনন্দ ঘোষ হাজরা। (২০০৮)। *সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিকতা ও উপনিবেশবাদ*। একুশ শতক, কলকাতা।

আমীনুর রহমান। (২০০৭)। 'ইম্পিরিয়ালিজম থেকে পোস্টকলোনিয়ালিজম'। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*। [সম্পা. ফকরুল চৌধুরী]। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। (১৯৭১)। *উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে*। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

দেবাশিষ ভট্টাচার্য। (২০১০)। *বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা*। অক্ষর পাবলিকেশনস, ত্রিপুরা।

নরহরি কবিরাজ [সম্পা.]। (১৯৯৭)। *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

ফজলুল আলম। (২০০৮)। *জ্যোতির্ময়কাল*। সংবেদ। ঢাকা।

ফয়েজ আলম (অনু.)। (২০০৭)। *অরিয়েন্টালিজম*। সংবেদ, ঢাকা।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। (২০১২)। *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য [সম্পা.]। (২০০৭)। *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৯১)। *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*। প্যাপিরাস, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম। (১৯৮৮)। *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭)*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম। (১৯৯৩)। 'রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট'। *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*। খণ্ড ১ [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম]। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। (২০১১)। *উপনিবেশের সংস্কৃতি*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

সুমিতা চক্রবর্তী। (২০০৭)। *সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে নজরুল*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সুশীলকুমার গুপ্ত। (২০০৭)। *নজরুল-চরিতমানস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

Bill Ashcroft and others (Edi.). (2004). *KEY-CONCEPTS IN POST-COLONIAL STUDIES*. Routledge. London.

Muhammad Mohar Ali. (1965). *The BENGALI REACTION TO CHRISTIAN MISSIONARY ACTIVITIES 1833-1857*. The Meherub Publications. Chittagong.